বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

১

"উল্লা হো—উল্লা হো হুইল্লাল্—লা হুইল্লাল্—লা হুইল্লাল্—লা"— সমস্বরে দশ-বারজন মাঝিমাল্লাদের এক সুরে একঘেয়ে চীৎকার কাজিঙ্গা চ্যানেলের দুটি তীরের ঘন জঙ্গলকে মাতিয়ে তুলছে···তার সঙ্গে দশ-বারখানা দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ শব্দ···

দাঁড়ের শব্দের তালের ছন্দ আর মোটা ভারী গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনিকে বারবার ব্যাহত করছে সূচীভেদ্য জঙ্গলের বিকট ঝিঁঝির ডাক।

···গায়ের মধ্যে থমথম করছে· সারা শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে ঝিমিয়ে আসছে···

এক অজানিত ভয় উৎকণ্ঠা নীরব অপেক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে···মুখের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে দিচ্ছে···আমরা চলেছি উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর পথে।

লেক এডোয়ার্ড আর লেক জর্জ—এদের দুটিকে সংযুক্ত করেছে এই কাজিঙ্গা চ্যানেল।

লেক এডোয়ার্ড থেকে আবার এক জলস্রোত বেরিয়ে নতুন নাম নিয়েছে—সেমলিকি নদী। সে নদী গিয়ে মিশেছে লেক অ্যালবার্টে।

কাটুই জঙ্গলের বুক চিরে সেমলিকি নদীর প্রখর স্রোত ছুটে চলেছে উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর পথে···লেক অ্যালবার্টের পশ্চিম কূলে কূলে।

আফ্রিকাকে কথায় বলে "কালো মহাদেশ" (DARK Continent), অথচ সূর্যকিরণ বোধকরি পৃথিবীর এই মহাদেশেই সর্বপ্রথম প্রখরিত হয়ে সারা বনস্থলীকে অগ্নিবাণে জর্জরিত করে। চড়া রৌদ্রের কড়া তাপে এখানকার লোকগুলোকে করে তুলেছে কষ্টিপাথরের খোদাইকরা মূর্তি··যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া···হাতে তাদের দোধারী বর্শা।

বিষুবরেখার উঁচু পিঠখানা যেন উটের পিঠের মত হঠাৎ কুঁজ তুলে ছুটে চলেছে সারা পৃথিবীটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে…নদী জঙ্গল পাহাড় কাউকেই রেহাই দেয় নি…।

সামনের পাহাড়টা যেমন উঁচু তেমনি ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল ধরে…সবাই বলে 'রিয়াঞ্জারো রেঞ্জ'…

বিষুবরেখার গরম তাপেও এর মাথায় মাথায় বরফস্রোত…একটা নয় তিন তিনটে শিখর…সব কটাতেই বরফ জমে কাঠ হয়ে রয়েছে। বিষুবরেখার শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বরফের মুকুট পরে এই তিন পাহাড় যেন প্রকৃতিকে উপহাস করছে…

এদেরই নাম 'চাঁদের পাহাড়' (Mount of the Moon).

সবচেয়ে উঁচু চূড়াটির নাম 'মারঘারিটা'—১৬,৭৯৫ ফুট—তারই ডাইনে বামে এমিন আর আলেকজেন্দ্রা—এদের উচ্চতাও কম নয়। ১৫,৭৫৪ ফুট আর ১৬,৭২৬ ফুট।

এই তিনপাহাড়ীর মাথায় আর পেছনের পিঠে যারা বসবাস করছে তাদেরও প্রকৃতির জীবদের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য জীবন।

মারঘারিটার চূড়ায় যাদের বসতি তারা কিন্তু শ্বেতাঙ্গ…তারা সাধারণ আফ্রিকানদের মত কালো নয়। এদের চুলও কালো কাফ্রীদের পশম-চুলের মত নয়। বছরের মধ্যে একবার মাত্র তারা পাহাড়ের নীচে নেমে আসে নুন সংগ্রহ করতে। বাকী সবই তাদের আছে…আছে চাষবাস, গৃহ, বনসম্পদ্ সবই।

মারঘারিটার পেছনে যাদের বসতি তারাই উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর বীভৎস 'পিগমী'র দল।

জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট তালপাতার ঘেরাটোপের মত ছাউনিতে এদের বাস… খায় কাঁচা মাংস…শুধু পশুর নয় নরমাংসও এদের বড় প্রিয়।…পিগমী…বেঁটেবামন!

বর্বরতায় বনের সব জন্তুদের হার মানিয়ে দেয়। ছোট ছোট দু' ফুট তিন ফুট মানুষগুলোর বুদ্ধি যেন সিম্পাঞ্জীদেরও হার মানায়।

দাঁতগুলোকে এরা উকো দিয়ে ঘষে সরু ধারাল ফলার মত করে রাখে…মুলোর মত দাঁত দিয়ে ছাগলছানা নয় মানুষ পর্যন্ত চিবোবে বলে।

এরা আবার মস্ত শিকারী…

তীর-ধনুকে এরা অসম্ভব পারদর্শী…অব্যর্থলক্ষ্য। তীরের ফলার আগায় থাকে সাপের বিষ। যাকে বিদ্ধ করে তাকেই নিমেষে মৃত্যুর নিশ্বাস ফেলতে হয়।

এরা জীবনে স্নান করে না…অথচ—

এরা অদ্ভুত সাঁতারু…কিন্তু জলকে এরা এড়িয়ে চলে…জলকে বড় ভয় পায় অথচ এরা অনায়াসে কুমীর জলহস্তীর কবল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে।

এদের দৃষ্টি যেমন প্রখর তেমনি হিংস্র…এদের দলের চলাফেরা অতি সাবধানী…

সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে এরা এদের ছোট ছোট প্রখর চোখগুলি পেতে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে রাখে…এরা যেন সব জঙ্গলের বহুরূপী।

যেমন রঙের মাঝে থাকে তেমনি রঙ বদলায়…এদের হাসিতে যেন মায়া মাখানো… কিন্তু সে হাসির পেছনে ভরা থাকে এক ভয়াল ভ্রূকুটি।

তাই বলছিলাম মাউণ্ট মারঘারিটার ওপরতলার লোক যেমন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য তেমনি মারঘারিটার অপর পারের জীবরাও হচ্ছে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য।

তীরবেগে নৌকা চলেছে অদ্ভুত সঙ্গীতের তালে তালে…

বাংলাদেশে নৌকাভ্রমণ করে মনে হয়েছিল কর্মময় জীবনের মাঝে মাঝে নৌকাভ্রমণে বার হলে মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে…কিন্তু আফ্রিকার এই ঘনতমসাবৃত বনের মধ্য দিয়ে নৌকাযাত্রায় মনে প্রতিটি মুহূর্তে আনছে শঙ্কা আর বিহ্বলতা…

দাঁড়ীদের গানের সুর ভেদ করে হঠাৎ এক বিকট চীৎকারে আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ করে দিল…মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক হর্নবিল পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে চীৎকারটা তাদেরই কণ্ঠাগত উল্লাস।

মনে মনে ভাবলাম…এমন উল্লাস তো কখন বাপের জন্মে শুনিনি…এ যেন পেটের পিলেটা পর্যন্ত চমকে তুললো।…মাখন সিং হেসে উঠলেন, বললেন—ভয় নেই, ওগুলা হর্নবিল পাখী।

মাখন সিং হচ্ছেন আমাদের এ অঞ্চলের শিকারী গাইড…

আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে গেলে চাই বনাঞ্চলের গাইড যাঁরা বন্দুক হাতে আপনাদের পথও দেখাবেন আর জীবনও রক্ষা করবেন। অবশ্য এঁদের রীতিমত অর্থ দিয়ে নিজেদের জুটিয়ে নিতে হয়। আমাদের টাঙ্গানাইকার গাইড ছিলেন মিঃ একম্যান… সুইডিশ হান্টার…কিন্তু তাঁর এ এলাকা নয়…এ এলাকার বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন মাখন সিং …পঞ্জাবকেশরী।

লেক জর্জের অনতিদূরে 'বারারা'…মাখন সিং সেইখানেই বসবাস করেন। কঙ্গো ও টোরোর জঙ্গলগুলা তাঁর নখদর্পণে।

হাতীর জন্যে বিখ্যাত জঙ্গল যেমন টোরো তেমনি 'কিবাকো' অর্থাৎ জলহস্তী, বিভিন্ন জাতের বন্যজন্তু, কুমীর ইত্যাদি জলজন্তুর জন্যে বিখ্যাত হচ্ছে এই কঙ্গোর জঙ্গল …এরই দুরন্ত বনবিভাগ ঘিরে ন্যাশনাল অ্যালবার্ট পার্ক যেখানে পৃথিবীর হেন কোন হিংস্র বনচর নেই যা না পাওয়া যায়…এমনকি ভয়াল ভয়ংকর গরিলা পর্যন্ত।

দশ-বারখানা দাঁড়ের ঘোলাবিজল তুফান তুলতে তুলতে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো বটে কিন্তু মাঝে মাঝে কিবাকোরা জলে তুফান তুলে হুস্ করে ভেসে উঠে

আমাদের নৌকার সোজা গতিকে বানচাল করে দিচ্ছিলো—একসঙ্গে এতগুলো জলহস্তী আমাদের জীবনে কখনও দেখিনি।

এদের দল যখন সচকিত হয়ে একসঙ্গে জল থেকে মাথা তুলে আমাদের নৌকার পানে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিলো যে এবার বুঝি আর নিস্তার নেই…কিন্তু,

এদের হিংসার চেয়ে নিজেদেরই ভয় বেশী—তাই জল তোলপাড় করে তীরের দিকে ছুটে চলেছে…

মানুষকে ভয় করে না এমন জন্তু বিশ্বে দুর্লভ। অথচ মানুষও মনে মনে সবার ভয়ে ত্রস্ত।

জঙ্গলের যে কোনো জন্তু…মানুষ দেখলে দূরে গা ঢাকা দিতে চায় যদি না তারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝলেই তারা ফিরে রুখে দাঁড়ায় প্রতিবাদ করতে…তখনই বাধে মানুষে জন্তুতে লড়ালড়ি।

কাফ্রী দাঁড়ীদের হেঁড়েলো স্বর শুনে তীরে তীরে হরিণ জিরাফের দল ছুটে চলেছে…জিরাফগুলো যখন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটে চলছে মনে হচ্ছে এক হলুদ রঙের ঢেউ নিকট থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে…এদের সঙ্গে অস্ট্রিচের দলও কম নেই।

নদী এবার গভীর জঙ্গলের মাঝে বাঁক নিয়েছে…পাশের জঙ্গলের ঝুঁকে পড়া গাছগুলো মাথা নীচু করে জল ছুঁয়ে রয়েছে…তাদেরই শাখায় শাখায় শাখামৃগেরা নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেরও আছে নিজের নিজের দল…এক এক গোষ্ঠীতে এরা শতাবধিও বিরাজ করছে। কেউ হলদে কেউ পাটকিলে, আবার কারো সারা অঙ্গ জেব্রাদের মত চিত্র-বিচিত্রিত।

পারে পারে হাতীদেরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। তবে তাদের বায়নাকুলার দিয়ে দেখতে হচ্ছে।…হঠাৎ নৌকার গতি মন্থর হলো। কাফ্রীভাষায় বয়রা চেঁচিয়ে উঠে বললো—বানাকুবা (মহাশয়) আগে মাট্—

কি ব্যাপার? আগে বাড়তে বারণ করছে কেন?

মাখন সিং ওদের ভাষায় কি যেন সব বললেন…তারপর আমার হাত থেকে বায়নাকুলারটা নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন…হঠাৎ বায়নাকুলার থেকে চোখ নামিয়ে বললেন—সর্বনাশ! নদীর এপার ওপার বেয়ে যে মাকড়সারা জাল বিছিয়ে রেখেছে…

আমি বললাম—মাকড়সার জাল তো কি হয়েছে…আমাদের চোখে মুখে তো জালের ঘেরাটোপ রয়েছে…নৌকা জাল ফেড়েই চলে যাবে।

মাখন সিং জিবেতে আর তালুতে মিলিয়ে একটা চুকচুক আওয়াজ তুলে বললেন

—তা হয় না মিঃ বোস। এ আপনাদের ইণ্ডিয়ার মাকড়সার জাল নয়। এদের নাম আফ্রিকান ব্ল্যাক স্পাইডার। এদের জালে ছোট ছোট বন্যজন্তু পর্যন্ত আটকে যায়।

বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি…

উনি বলেন—এখন মনে হচ্ছে হর্নবিল পাখীগুলো কেন অমন চীৎকার করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল। জানেন মিঃ বোস এ জালে পাখীরা প্রায়ই বন্দী হয়ে মাসাবধি ঝুলতে থাকে আর মাকড়সাগুলি ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করতে থাকে।

বিষুবরেখার ধারের দেশগুলোকে ক্রান্তিমণ্ডল বলা হয়। কর্কটক্রান্তিতেই এরা সবচেয়ে বেশী উৎপাত করে…তখন এরা এই সমস্ত পাখী শিকার ছেড়ে ছোট ছোট বন্যজন্তু ধরার চেষ্টায় গাছ থেকে গাছান্তরে জাল বিছোতে থাকে…তখন জঙ্গলে প্রবেশ করে কার সাধ্য…ওই দেখুন মিঃ বোস, নদীর জলে এসে জালটা ছুঁয়ে পড়েছে তাই দুটো মাছ জলের উপর লাফাতে গিয়ে ওদের জালে বাঁধা পড়ে কেমন করছে।

বায়নাকুলারটা নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন… [পৃষ্ঠা ১৬০

এই সমস্ত মাকড়সার মাথা আর পেটের উপরভাগের ব্যবধানে বাদামী আকারে একখানা কঠিন ফলক আছে—পেটটা তাতেই সংযুক্ত। পেটটা ফোলা আর ভারী নরম। আটটি পায়ে সাতটি করে গাঁট রয়েছে আর শেষের পায়ে কাঁকুইয়ের মত দুটি কাঁটা থাকে। এদের সামনের চোয়াল সাধারণ মাকড়সার মত পতঙ্গচোয়াল নয়…ঐ চোয়াল ওরা সব দিকে ঘুরিয়ে নাড়তে পারে…চোয়ালের শেষে তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে—তার মধ্যে কিংবা পাশে অতি ক্ষুদ্র ছেঁদা আছে…সেই ছেঁদা দিয়ে বিষাক্ত তরল পদার্থ বার করে দেয়…আর দুটো চোয়ালের মধ্যে জিবটাকে মুখের বাহির ইন্দ্রিয়ের মত ব্যবহার করে।

এরা কেউ সাধারণ মাকড়সার মত জালে বাস করে না…এরা জাল বিস্তার করে পাশে গর্ত খুঁড়ে বাস করে যাতে শিকারের কোন বাধা না হয়…যখন শিকার ধরা পড়ে তখন দল বেঁধে তাকে করে নিঃশেষ।

মিঃ ব্যানার্জী, আমার সহকর্মী বললেন—সিলোনে একরকম মাকড়সার কথা শুনেছিলাম, তারা নাকি টিকটিকি পর্যন্ত শিকার করে…

আমি বললাম—তা কেন, হিমালয়ে পাটকিলে রঙের একরকম মাকড়সা আছে যারা নাকি জাল বিছিয়ে পাখী পর্যন্ত ধরে। কিন্তু ছোট ছোট জন্তু ধরে খায় এ কথা এই প্রথম শুনছি—

মাখন সিং হেসে বললেন—মাকড়সা বহু জাতেরই আছে এবং ভিন্ন উপায়েও শিকার ধরে…কিন্তু এই কালো মাকড়সারা সারা পৃথিবীর বিস্ময়…এরা হচ্ছে 'ট্যারেন্টুলা' গ্রুপের।

ট্যারেন্টুলা নামটা আমার জানা ছিল যা হোমিওপ্যাথি ওষুধে পাওয়া যায়… শুনেছি সে ওষুধটা মাকড়সার রস থেকেই তৈরী…যাতে করে প্লেগ পর্যন্ত সারে… তাই জিজ্ঞেস করি—ট্যারেন্টুলার কথাটা ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলুন তো!

মাখন সিং বললেন—এদের দু'রকম জাত আছে…একটা ছোট, আর একটা বড়। ছোটগুলো নানা রঙের হয়—কালো, হলদে, গোলাপী, এমনকি সাদা…এরা বালির ওপর দিয়ে চললে বেশ বোঝা যায়—কিন্তু বড়জাতের ট্যারেন্টুলা গ্রুপের মাকড়সারা দেখতে পাটকিলে থেকে কালো রংএর হয়…এরা পাখী ছোট জন্তু শিকার করে খায়। এরা নদীর পাশে বালিমাটিতে বা শুধু বালুচরে নিজেদের বাসা বাঁধে। জালের সামনে ট্রাপ-ডোর থাকে। জন্তু বা পাখী সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়…অর্থাৎ মরণফাঁদে ফেলে শিকার করে। শিকার পড়লেই ছুটে এসে শিকারের গায়ে কামড় দিয়ে বিষাক্ত রস তার সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়, তখন জন্তুটি বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে মরে যায়।

যে জালখানা নদীর এপার-ওপার বিছিয়ে রেখেছে ওটাকে ছিঁড়ে নৌকা যদি চলে যায় তাহলে নৌকাটা নিজেই আটকে পড়বে তাই একে ক্রস করে যেতে হলে অন্য উপায় স্থির করতে হবে…

নৌকা ধারে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে…

মাখন সিং কাফ্রীভাষায় বন্দের কি যেন বললেন…তারা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থায় তীরে নেমে পড়লো…এবং অপর দল চলে গেল অপর পারে…এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'পারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে।

কাজিঙ্গা চ্যানেলের দুই তীরের কিনারা ধরে আগুনের শিখা হঠাৎ যেন তরল স্রোতের মত ছুটে এগিয়ে চললো সেই মাকড়সার জালের দিকে।

তরল স্রোতাগ্নি দেখে বললাম—এ কি করে সম্ভব যে আগুনের শিখা স্রোতের মত ছুটছে?

মাখন সিং বললেন—এর দু'পাশের উইড্‌সগুলো কাঁচা অবস্থাতেই দাহিকা শক্তি রাখে। আর শুধু রাখে না প্রায় কর্পূরের মত দাহিকা শক্তিসম্পন্ন। যেমন কাশ্মীরে 'জুনিপার' গাছের কাঁচা ডালগুলো দাউদাউ করে জ্বলে।

নদীর দু'পাশে আগুনের স্রোত দেখে পারের জন্তুজানোয়ার উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

আগুনের হলকায় বাতাসের জোর বেড়েছিল—

সেই জোরালো বাতাসে হঠাৎ উড়ে চললো একটা প্রকাণ্ড সিল্কের সুতোর জাল… তা যতদূর এগিয়ে চলে যেন বেলুনের মত চুপসে যেতে থাকে সূর্যকিরণ পড়ে—এ আর এক অভিনব দৃশ্য…

২

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম লেক এডোয়ার্ডের মোহনায়। সন্ধ্যা বলতে এখানকার সন্ধ্যা নয়…ঈস্ট আফ্রিকায় সন্ধ্যা নামে রাত সাতটায় কিন্তু বিষুবরেখায় সন্ধ্যা নামে রাত সাড়ে আটটায়। অথচ চাঁদ যথাসময়েই ওঠে অর্থাৎ বেলা পাঁচটায়। সূর্য তখনও ধকধক জ্বলতে থাকে পশ্চিম আকাশের ওপরতলায়।

দিনের বেলায় এমন চাঁদ দেখেছিলাম 'মাউ সামিট'এ। 'মাউ সামিট' আর 'ইকোয়েটর' এই দুটি জায়গাতেই রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইকোয়েটরের উচ্চতা ১০,০০০ ফুট আর মাউ সামিটের হচ্ছে ৮,৩২২ ফুট। দুটি স্টেশনই হচ্ছে বিষুবরেখার পাহাড়ী শিরদাঁড়ায় অবস্থিত।

পাহাড়ী শিরদাঁড়া এই জন্যে বলছি কারণ বিষুবরেখার প্রাকৃতিক গঠন যেন একটি পাহাড়ী শিরদাঁড়া…পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা নিয়ে সারা পৃথিবী বেয়ে ছুটে চলেছে। এই শিরদাঁড়ার সর্বোচ্চতা সৃষ্টি করেছে রিয়াঞ্জারো রেঞ্জ।

মানুষ বিষুবরেখার শিরদাঁড়া আবিষ্কার করে তাতে সাদা চুনের দাগ দেগে দিয়েছে…তার দু'পাশে বড় বড় অক্ষরে সাদা রং দিয়ে ইংরেজীতে লিখে রেখেছে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার আর সাদার্ন হেমিসফিয়ার, যার কথা আমার 'বনে জঙ্গলে' বইএ লেখা হয়ে গেছে।

লেক এডোয়ার্ডের মোহনায় নৌকা বাঁধা হলো। স্থানটি ঘন জঙ্গলে আবৃত··· কিনারায় নৌকা রাখতে ভয় করে, যদি কোনো জন্তু এসে রাতে আক্রমণ করে!

মাখন সিং বললেন—নীচে নেমে বয়রা রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে ক্যানেস্তারা পিটবে'খন ···তাহলে ভয় থাকবে না···

ভয় থাকবে না বলে মাখন সিং ভরসা দিলেও আমাদের সঙ্গীদের কারো মন থেকে এতটুকু ভয় দূর হলো না। ত্রস্তদৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম।

অন্ধকার হবার প্রাক্কালেই বয়রা আর দাঁড়ী-মাঝিরা নদীর ধারের জঙ্গলে আগুন জ্বেলে দিল—সেই আগুন ঘিরেই বসলো ওদের ভোজের আসর। গত দিনে বনের মধ্য থেকে একটা বিরাট বন্যবরাহ মারা হয়েছিল, তাই পুড়িয়েই ওদের ভোজের সভা···

আমরা নৌকায় বসে গিনি ফাউলের মাংস আর পাঁউরুটির শ্রাদ্ধ করতে শুরু করলাম।

ডিনার সভার বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং মাখন সিং। তিনি আমাদের এদেশের গোল্ড-ডিগারদের গল্প বলতে শুরু করেছেন।

যাঁরাই আফ্রিকার এ অঞ্চল ঘুরে দেখে আসেন তাঁদের মুখেই শুনতে পাবেন গোল্ড কোস্টের সম্মোহনী কাহিনী। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার মতোই আফ্রিকার গোল্ড কোস্ট ···প্রায় তিনশ সত্তর মাইল ধরে স্বর্ণ সৈকতের বিস্তৃতি। এ ছাড়া এ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ, বাক্সাইট, হীরা, টিন, গন্ধক···এমনি কত যে খনিজ সম্পদ্ তা বলে শেষ করা যায় না।

তবে ভোল্টা নদীর অববাহিকা ধরেই স্বর্ণ সৈকতের প্রসিদ্ধি। সৈকতের বালিতেই যে শুধু স্বর্ণচূর্ণ পাওয়া যায় তা নয়, বড় বড় সোনার পাহাড়ও লেক অ্যালবার্টের পশ্চিম কিনারে সারি সারি দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন এ সমস্ত পাহাড় থেকে এক টনের ওপরও সোনা সংগ্রহ সম্ভব হয়, তবে গোল্ড-ডিগাররা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ীই স্বর্ণ খনন ও সংগ্রহ চালান।

পূর্ব সীমানা 'কুইটা' থেকে শুরু হয়ে স্বর্ণ সৈকত পশ্চিমে 'অশ্বিনী' পর্যন্ত সীমা ঠিক করেছে। এই সৈকতের দু'পাশ ঘিরে পাহাড় আর জঙ্গল···এসব পাহাড়ের বুকেও সোনা পাওয়া যায়। এই সব পাহাড় বেয়ে যে সমস্ত নদী ভোল্টার বুকে নেমে এসেছে তাদের জলেও সোনার কুচি।

পাহাড় ধুয়ে ভোল্টার বুকে জলধারা এসে পড়ার মুখে বালুস্তূপে-স্তূপে জড় হয় এই সব স্বর্ণচূর্ণ···এ ছাড়া আরও বিখ্যাত দুটি নদীসৈকত রয়েছে···সেখানেও অজস্র সোনা···

'আন্কোবরা' আর 'প্রা'···

এই তিনটা নদীর মিলনস্থানটির নাম 'থ্রি পয়েন্ট'। এই থ্রি পয়েন্ট পর্যন্ত বিস্তারিত এই সৈকত।

মাখন সিং বললেন গোল্ড-ডিগারদের ভয়াবহ জীবনের কথা···তিনশ সত্তর মাইল-ব্যাপী স্বর্ণ সৈকতে গোল্ড-ডিগারদের পাহারাদারী···অথচ এই বিস্তৃত জলাভূমি ঘন বনসংকুল এবং বিভিন্ন নরখাদক পশু ও জংলীদের বসবাস··

একলা পেলেই পথিক ও ভ্রাম্যমাণদের ধরে বেঁধে আগুনে ঝলসে তারা ভোজ সমাধা করে।

এদেরই একদল হচ্ছে পিগমি বা বেঁটেবামন।

জংলীদের অগ্নিই হচ্ছে আরাধ্য দেবতা।

আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া তাই তাদের কাছে পরম পবিত্র ভোজ···

আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া তাই তাদের কাছে পরম পবিত্র ভোজ···কারণ প্রথমে অগ্নিদেবতা প্রসাদ করে দিয়েছেন···তারপর তাদের ভোজের উৎসব। অগ্নিদেবতার উৎসবেই নাচ-গান গাছের রস সেবন চলে···মানুষদের জ্যান্ত গাছে বেঁধে পোড়ায় আর আনন্দ হুল্লোড় চলে।

জিজ্ঞেস করলাম—এসব বায়স্কোপের ছবিতে দেখেছি বটে তবে সত্যি কি এসব এদের বন্য আচার?

মাখন সিং বললেন—আজও এ পদ্ধতি গভীর জঙ্গলের জংলীদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে···কেবল টাউনের কাফ্রীদেরই কিছুটা জাগরণ হয়েছে—তবে অগ্নিকে দেবতা বলে ব'লে বন্দুককে ওরা ভয় পায়···বন্দুক ছুঁড়লে ভাবে বুঝি অগ্নিদেবতা রাগ করে অগ্নিবৃষ্টি স্ফুরণ করছেন।

ছোট ছেলেদের মতো গল্প শুনতে শুনতে কখন যে খাওয়া শেষ করেছি জানি না হঠাৎ একটা টংকারধ্বনিতে চমকে উঠে উঠে দাঁড়ালাম।

সকলেই সচকিত···মায় মাখন সিং পর্যন্ত···

বয়রা তাদের হুল্লোড় থামিয়ে কান খাড়া করে সে টংকারে মনোযোগ দিল···

অতিদূর হতে সে টংকারধ্বনি ভেসে আসছে—মনে হচ্ছে যেন একশখানা নাকাড়ায় একসঙ্গে ঘা দিয়ে চলেছে।

বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধকধকে আওয়াজটা যেন প্রখর হয়ে কানে এসে বাজতে থাকে · সবার মুখেই দেখা যাচ্ছে এক আসন্ন সংকট-ছবি।

উৎকীর্ণ মাখন সিং নিশ্বাস ফেলে বললেন—ভয় নেই, tusk-seekerএর দলেদের দামামা।

টাস্‌ক-সীকার ?···সে আবার কি ?

মাখন সিং বললেন—এ এক মজার আশ্চর্য গল্প-কথা বলতে পারেন। টাস্ক-সীকাররা হাতীর দাঁতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। আফ্রিকার বন্যহাতীদের ধরাও যেমন শক্ত বশ করা তার চেয়েও বেশী শক্ত। কাজেই হাতীর রাজত্বে এসে হাতীর দাঁতই যদি যোগাড় না হয় তা ভারী মুশকিলের কথা তো···

কিন্তু আফ্রিকার হাতী পোষ মানানো সোজা নয়। তাই হাতী মেরেই দাঁত সংগ্রহ করা পদ্ধতি চলে আসছিল বহুদিন ধরে। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীঃ এডোয়ার্ড ডেলাউ সাহেব হাতীর মরণগুহা আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করেছিলেন অভিনব উপায়ে।

বাজারে অর্থাৎ বুনোদের হাটে বাটা সিস্‌টেমে কিছু কিছু হাতীর দাঁত যে যোগাড় হতো না এমন নয় তবে প্রচুর পরিমাণে হাতীর দাঁত পেতে গেলে হাতীদের ধরে, বশ করে দাঁত কেটে নেওয়াই আফ্রিকার সব জায়গার প্রথা। (ক্রমশঃ)

বল তো মেয়েটি কি করছে ?

(না পারলে ২০১ পৃষ্ঠায় দেখ)

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

অ্যালবার্ট ডেনার্ড সাহেব একদিন এক হাতীর পেছনে ধাওয়া করতে করতে গভীরতম জঙ্গলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। প্রায় কুড়ি দিন হাতীটি এ-জঙ্গলপথ ও-জঙ্গলপথ ঘুরে ঘুরে শেষে এসে পৌঁছলো এক নিরালা পাহাড়গুহার বিরাট প্রকোষ্ঠে।

ডেনার্ড সাহেব দেখলেন গুহাভ্যন্তরে রাশি রাশি হাতীর দাঁত আর হাড় পড়ে রয়েছে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন—দেখলেন যে হাতীটিকে তিনি অনুসরণ করে নিজেকে সর্বহারা করেছেন সেই হাতীটি গুহার এক কোণে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন কিসের অপেক্ষা করছে···বেশীক্ষণ যায়নি হঠাৎ হাতীটি ঢলে পড়লো গুহার পাথরের পাশ গায়ে···

বিরাট শব্দ করে হাতীর দেহ ভূশয্যা গ্রহণ করলো···

ডেনার্ড সাহেব বুঝলেন হাতীটি মারা গেছে···

মৃত্যুর অবধারিত দিন কবে তা হাতীরা বোধহয় বুঝে ফেলে। এই হাতীটিও তার মৃত্যুর দিন আগত বুঝে জঙ্গল পরিক্রমা করে তাই চলে এসেছে মরণগুহায়, এবং এইখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস ফেললো।

ডেনার্ড বুঝলেন গুহার ভেতর এত রাশি রাশি হাতীর হাড়, শুঁড় আর দাঁত কেন।

হাতীদের মৃত্যুগুহার সন্ধান পেয়ে ডেনার্ড হাতীর দাঁত, হাড় যোগাড় করলেন বটে কিন্তু জঙ্গলের বাইরে বেরুবার পথ খুঁজে পেলেন না।

প্রায় এক রাত আর একটা দিন অপেক্ষা করার পর ডেনার্ড শুনতে পেলেন এই কোদগুটংকার ··

ভীতত্রস্ত হয়ে গুহাটার একপাশে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন ডেনার্ড।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলেন যে এক জংলীর দল জয়ঢাকে সমস্ত গুহাকে রণিত ধ্বনিত করে এসে ঢুকলো এই গুহারই মধ্যে।

জংলী নরখাদকরা এসেছে মৃত হাতীর মাংসের লোভে। ডেনার্ড বুঝলেন হাতীদের মরণগুহায় এসে তাই কোনো পচা গন্ধ তিনি কেন পাননি। জংলী নরখাদকরা উল্লাস করে মৃত হাতীদের মাংসে উদরপূর্তি করে, বাকী মাংস সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলে আপন ডেরায়···

ওদেরই অনুসরণ করে ডেনার্ড জঙ্গলের বাইরে যাবার পথ খুঁজে পান। পরে নিজের লোকজন এনে হাতীর দাঁত, নখ, হাড় সংগ্রহ করতে শুরু করে দেন।

সেইদিন থেকে হাতীর দাঁত সংগ্রহ শুরুর পথ বেরোলো—প্রতিষ্ঠিত হলো আইভরি কোস্ট।

আমার মনে হয় টরো জঙ্গলের শেষ সীমানায় আমরা এসেছি—এবং অদূরের ঐ পাহাড়তলেই বোধহয় হাতীদের মৃত্যুআগার। হয়ত কাল পরশুর মধ্যেই কোনো হাতীর মৃত্যু ঘটেছে তাই আজ জংলীদের এই টংকারধ্বনি। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে এ আওয়াজ একজায়গায় দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে—এ শব্দ এগিয়ে আসার শব্দ নয়। তাই বলছি ভয় নেই···

'ভয় নেই' কথাটায় আমরা হয়ত ভয়শূন্য না হলেও মাখন সিংএর কথায় ভরসা পেলাম কিন্তু দেশী বয় ও মাঝিমাল্লারা এতটুকু স্তোক পেলো না।

ওরা যেন কেমন হাকুপাকু শুরু করে দিল। মাখন সিং শেষে ওদের কথাতেই রাজী হয়ে বললেন—তাহলে আমরা এক কাজ করি, তীর থেকে নৌকা ছেড়ে জলের মাঝেই নোঙ্গর ফেলি···হয়ত তাতে সবাই সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কথাটা সবাই অনুমোদন করে নৌকায় উঠে বসলো। অন্ধকারে নৌকা এগিয়ে চলেছে···দূরের চাঁদ তখন প্রায় অস্তমিত।

লেক এডোয়ার্ডের গভীর জলে নৌকা চলেছে ছপছপ শব্দ করে···চাঁদ ডুবে গেছে তাই সূচীভেদ্য অন্ধকার।

৩

অদূরের বনানীর ভয়ত্রাসবিহ্বল ঝিল্লীর কটকটধ্বনি শোনা যাচ্ছে···তারই মাঝে মাঝে কিবাকোদের অট্টহাসি···সে যে কী ভয়ানক ভয়াবহ তা ভাষায় বোঝানো যায় না।

কিবাকোদের এই অট্টহাসি শুনেছিলাম এর আগে মারচিশন ফলসের রিভার-মাউথে। জলহস্তিনী আর হস্তীদের এ হাসি পরস্পরের সৌহার্দ্যজ্ঞাপন বলে শুনেছিলাম ··· কিন্তু ঘন অন্ধকারের মাঝে চারপাশ ঘিরে এ অট্টহাসি যে কত হৃদয়বিদারক তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম।

যদিচ এ ভয় শুধু আমার মত শহরবাসীদের মাত্র, কারণ দেশী বয় আর মাঝিমাল্লারা এ বিকট হাসির পরোয়া করছিল না···বরং ওরা পরোয়া করেছিল তীরের অরণ্যসংকুল ঐ শব্দভেদী বিকট টংকারকে।

মাখন সিং আমাদের অবস্থা বুঝে সাহস দিয়ে বললেন—কিবাকোরা বড় নিরীহ···ওরা পারতপক্ষে কারো ক্ষতি করে না···ওদের নিজেদের আনন্দে নিজেরাই মেতে থাকে···

হঠাৎ এক বিরাট ধাক্কায় নৌকাখানা টলে উঠলো—সবাই বেসামাল হয়ে এ ওর ঘাড়ে পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে···নৌকার সবাই যেন সে আলোড়নে তাল পাকিয়ে গেল।

ডেনার্ড সাহেব দেখলেন গুহাভ্যন্তরে···পড়ে রয়েছে। [পৃষ্ঠা ২৭৯

···কি হলো···কি হলো?

মাঝিরা তাল সামলে বললো—কিবাকো—অর্থাৎ নৌকার তলদেশে কিবাকোরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টায় আমাদের নৌকার এই দশা···

মাখন সিং বললেন—ভয় নেই···

ভয় নেই কি মশয়···এর চেয়ে আর কি ভয়াবহ হতে পারে? এর চেয়ে ভয় পেতে গেলে তো সখাদ সলিলে হাবুডুবু খেতে খেতে কুমীরের পেটে যাওয়া—

বললাম—বলেন কি মশয়, ভয় আবার নেই—ভাগ্যে আপনার দয়ালু কিবাকো একটু পাশ ফিরেছিলেন তাই নৌকাখানা একটু কাত হয়েই এযাত্রা রক্ষা পেলো—নইলে যদি নৌকার তলাতে কিবাকো মহাশয় ঢুঁ মারতেন তাহলে কি হতো একবার ভেবে দেখুন। এর চেয়েও নদীর কিনার ছিল ভালো···আপনি বরং সেই ব্যবস্থাই করুন···

কারণ মাঝরাতে যখন সবাই ঘুমে ঢুলে পড়বে তখন যদি এরকম একটা ব্যাপার ঘটে বসে তাহলে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

মাখন সিং হয়ত আমার কথার তাৎপর্য বুঝলেন…তারপর মাঝিমাল্লাদের রাজী করিয়ে নৌকাখানাকে পেমগিকি নদীর মোহনায় নিয়ে যেতে বললেন।

মাঝিরা বেন অনিচ্ছায় রাজী হলো…নৌকা খুব ধীরে ধীরে কিনার ধরে নিলো …তারপর…

ঝপাৎ—ঝপাৎ—ঝপাৎ—

ছিটকে ছিটকে পড়ছে কি যেন জলে তীর থেকে—তারপর এক জলোচ্ছ্বাসের আওয়াজ তুলে হঠাৎ নিশ্চুপ হলো…

সবাই চমকে উঠেছি।

মাখন সিং বললেন—ও কিছু না, পারের কুমীরগুলো নৌকার শব্দে জলে লাফিয়ে পড়ছে—

ব্যানার্জী বলল—কিছু না মানে…হঠাৎ যদি একটা নৌকার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে ?

মাখন সিং উত্তর দেন—না না সে ভয় নেই…এখনও নৌকা তীর থেকে অন্ততঃ দশ ফুট দূরে…অত জোরে ওরা লাফায় না…

আমি বলি—ওদের লাফের দৌড়ও কি সর্দারজী জানেন ?

সর্দারজী বললেন—তা একটু জেনে রাখতে হয় বইকি।

আমি বলি—তা না হয় হলো কিন্তু নদীর মাঝে গেলে কিবাকোর দল, তীরের কাছে এলে কুমীরের দল…এই যে উৎপাত শুরু করেছে—বলি নৌকা বাঁধবেন কোথায়…

আর এই অন্ধকারে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো কম বিপজ্জনক নয়। কুমীরের একটা ল্যাজের ঝাপটা খেলে নৌকা বানচাল হয়ে যাবে। এ তো আর টিনের কুমীর নয় যে বাগিয়ে সাগিয়ে কোনোরকমে ম্যানেজ করবেন।

সর্দারজী হেসে উঠে বলেন—কেন, আপনি কি টিনের কুমীর ম্যানেজে এক্সপার্ট ?

আমি বলি—তা খানিকটা। জানেন না একবার একটা ইংরেজী ছবি দেখেছিলাম —ছোট্ট ছবি, বোধহয় ড্‌ক্যুমেন্টারি। তাতে জঙ্গলে কি করে ছবি তুলতে হয় শেখানো হয়েছে।

একটা টিনের কুমীরের অর্ধেকের পেছনে বড় বাঁশ লাগানো আছে। জলে নেমে মানুষ হেঁটে হেঁটে সেটাকে জলের ওপরতলা দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সামনে কাছে একটা কাফ্রী প্রাণপণে যতই সাঁতার দিচ্ছে পেছনের কুমীরের আগে বাড়ার তেজ ততই বাড়ছে, অর্থাৎ মানুষটা বাঁশটি জোরে ঠেলে চলেছে। ক্যামেরা কুমীরের মুখের দিক আর মানুষের সাঁতার কাটাটুকু ছবির ফ্রেমে ধরে ছবি তুলছে…শেষ পর্যন্ত তারের

খেলায় কুমীর তার মুখব্যাদান করল… ভীতত্রস্ত কাফ্রী চীৎকার করে ডুব দিল…সঙ্গে সঙ্গে কুমীরের মুখের দিকটাও জলে ডুবে গেল…তারপর দুজনে কি মাতামাতি…শুধু জলের উত্তাল জলোচ্ছ্বাস…না দেখা যাচ্ছে কুমীর, না দেখা যাচ্ছে মানুষটাকে …হঠাৎ মানুষটার পাদুটো জলের ওপর শূন্যে একবার উঁচু হয়ে উঠে তলিয়ে গেল…

আওয়াজ এলো—কাট্‌……ক্যামেরা থেমে গেল…শব্দ হলো—ও. কে. (O. K.)

তখন দেখানো হলো বাঁশের ডগায় বাঁধা আধখানা কুমীর, পেছনের তার টানার কায়দায় তার প্রকাণ্ড হাঁ খুলছে আর বুজছে; এবং জলজ্যান্ত মানুষটা জল থেকে উঠে দাঁড়ালো…বুঝুন কেমন ফাঁকিদারী 'শট'…। দর্শকরা ভাবছে সত্যিই বুঝি মানুষে কুমীরে লড়াই হয়ে মানুষটাকে কুমীর জলের তলায় তলিয়ে নিয়ে গেল।

ছিটকে ছিটকে পড়ছে কি যেন জলে তীর থেকে— [পৃষ্ঠা ২৮২

তাই বলছিলাম—এসব কুমীরগুলো যদি টিনের হতো ত ম্যানেজ করা যেতো—কিন্তু এ যে একেবারে ম্যানঈটার কুমীর !…হঠাৎ যদি…

মাখন সিং হো হো করে হেসে উঠে বললেন—আরও একটু এগিয়ে গেলে এসব উৎপাত আর থাকবে না।

নৌকাটা মাঝিরা তীর থেকে আরও কিছু দূর সরিয়ে নিয়ে চলেছে…অন্ধকার তাই কিছুই লক্ষ্য হচ্ছে না…খালি এক ভাসমান আধারে সব কজন যাত্রী নিঝুম নিঃশব্দে ভেসে চলেছি…

সরসর শব্দ হচ্ছে—মনে হচ্ছে নৌকার তলায় কি যেন লাগছে…

বললাম—কি যেন নৌকার তলে ঠেকছে…

মাখন সিং বললেন—হ্যাঁ, এ সব জায়গায় কতকাংশ খুবই শ্যালো—কোমর পরিমাণ জল হবে। আসলে কি জানেন…কঙ্গো বেসিনের সবচেয়ে বড় নদী হচ্ছে কঙ্গো

নদী…এর কতকাংশ যেমন ভয়াল বিস্তারিত…আবার এর উৎপত্তিও বহু লেক ও বহু মারসি জল বিবর্তনে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাতাঙ্গার কথা পাই কঙ্গো বেসিনের তথ্য জানতে গেলে… কাতাঙ্গা নদীই তো কঙ্গোর আসল স্রোত ?

মাখন সিং বললেন—কি জানেন, কঙ্গো নদীর সৃষ্টির কথা বলতে গেলে প্রথমেই জানা উচিত বেলজিয়ান কঙ্গোটির অবস্থান কোথায়…কঙ্গোর পশ্চিমে আতলান্তিক ও অ্যাংগোলা উপকূল প্রায় পঁচিশ মাইল ধরে বিস্তারিত…দক্ষিণে পড়ছে পর্তুগীজদের অধিকৃত দেশ…উত্তরে ফ্রেঞ্চ বিষুবরেখাস্থিত সমস্ত মালভূমি…উত্তর-পুবে অ্যাংলো-ইজিপসিয়ান সুদান দেশ…পূর্ব দিকে ইউগাণ্ডা আর টাঙ্গানাইকা…দক্ষিণ-পুবে হচ্ছে উত্তর রোডেসিয়া…এবং পুরো দক্ষিণে হচ্ছে অ্যাংগোলা। কাজেই সবকটি দেশের বড় বড় লেক প্রপাত সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কঙ্গো নদী…তাই বহু পাহাড়ী জংলী নদী, ক্রেটার লেকের স্রোত, উপনদী মিশে গিয়ে কঙ্গোকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে…আরও মজার কথা কি জানেন… আফরিকানরা কঙ্গো নদীকে বলে "জায়রি"…এর মানে যে নদীর সীমা শেষ নেই।

সত্যিই প্রমাণিত হয়েছে যে আমেরিকার অ্যামাজোন নদীর পরই কঙ্গো নদীর বিস্তার। পৃথিবীর সব নদীর মধ্যে দৈর্ঘ্যে বড় হচ্ছে অ্যামাজোন…কাজেই কঙ্গো নদীকে পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ নদী অনায়াসেই বলা চলে।

আরও একটা বিশেষত্ব এই যে কঙ্গো নদী অ্যামাজোনের চেয়ে ভয়াল এবং ভয়ংকর। কারণ অ্যামাজোনে পাহাড় জঙ্গল প্রপাত হয়ত সবই পাবেন কিন্তু কঙ্গো নদীর মত ক্রেটার হ্রদ জংলী মার্সি ল্যাণ্ডের মধ্যে ঢুকে আবার প্রপাত সৃষ্টি করে বারবার বেরিয়ে আসতে অ্যামাজোনকে পাবেন না—এত গর্জন বোধকরি কোনো নদীরই পৃথিবীতে নেই…এ ছাড়া অন্যান্য নদীর জলে হয়ত মাছ, কি হাঙর কুমীর পর্যন্ত পাবেন কিন্তু কঙ্গো নদীর জলে ভর্তি রয়েছে জলসিংহ, হাঙর, শুশুক, সাপ…কি যে নেই তা আজও নির্ণয় করে উঠতে পারা যায়নি। তাইতো লিভিংস্টোনের মত দিগ্বিজয়ীকেও পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছিল।

বোধহয় ১৪৮২ কি ৮৩ সালে এক পর্তুগীজ পরিব্রাজক এর প্রথম সন্ধান পান। ভদ্রলোকের নাম ছিল 'ডিওগো ক্যাও' অথবা 'কাম', ঠিক মনে নেই। আবিষ্কারক পর্তুগীজদের মান বাড়াবার জন্যে এর মাঝখান থেকে একটা মারবেল স্তম্ভ খাড়া করে তুললেন, অর্থাৎ পর্তুগীজ বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করেন…যাকে আজকাল বলে "শার্কপয়েন্ট" (Sharkpoint)…সেই সময় দেশীয় জংলীরা ঐ মারবেল স্তম্ভ দেখে নদীর নতুন করে নামকরণ করেছিল "রিও ডি প্যাড্রাও" (Rio de Padrao)—মানে (Pillar River)—

স্তম্ভ নদী। কিন্তু এ নাম ধোপে টিকলো না…কাজেই আদিবাসীদের "জায়রি" নামই বেঁচে উঠলো। কিন্তু বৈদেশিক শক্তিরা ছাড়লেন না…জায়রির আবার দেশী নামকরণ করলেন যাতে দেশী লোকেদের উচ্চারণে অসুবিধা না হয়…নাম হলো কঙ্গো।

এর প্রায় দুশ তিনশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন জে. কে. টারকি দলবল নিয়ে আসেন কঙ্গো নদীর অববাহিকা ধরে বন-সম্পদের খোঁজে…তাঁর জয়যাত্রা মৃত্যুতেই নিঃশেষ হয়ে গেল।

কারণ কঙ্গো নদীটা যেন একটা মাকড়সার জাল…এর কত যে শাখাপ্রশাখা তার ইয়ত্তা নেই…কোন্ পথে গেলে কি যে ঘটবে তা আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয়নি। ফলে বহু স্রোতের ধারাকে অনুধাবন করতে গিয়ে তিনি খেই হারালেন। তা ছাড়া জলে স্থলে পদে পদে বিপদ্। ডাঙ্গায় শুধু ভয়াল জন্তুজানোয়ার নয় ভয়ংকর নরখাদকদের বাস, আর জলে সাপ কুমীর জলহস্তী ইত্যাদিতে তাঁকে যেন ঘিরে ধরলো। খাদ্যও যা সঙ্গে এনেছিলেন প্রায় নিঃশেষ…তা ছাড়া এর অববাহিকার এক এক জায়গায় এক এক রোগের উৎপাত।

উনি লিখে গেছেন জুলাই মাসে বৃষ্টির অন্তে তিনি বুঝলেন যে তাঁর ফিরে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই…

কারণ বর্ষার শেষে কঙ্গোরও যেমন রূপ পালটে গেল আশপাশের জঙ্গলেরও রূপ পালটে গেল…আকাশের মাঝে চলন্ত মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপালের দল (locust) হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়ে তাঁর সারা দলকে তাদের প্রবল আক্রমণে ব্যস্ত করে তুললো…

আমি জিজ্ঞেস করলাম—পঙ্গপালদের দেখা আমরাও তো মারচিশন ফলসে পেয়েছিলাম—তারা তো মানুষের কোনো ক্ষতি করে না !

মাখন সিং বললেন—না, মানুষের এমনি কোনো ক্ষতি করে না বটে কিন্তু যখন তাদের ঝাঁক কোটিতে কোটিতে এসে নৌকা ছেয়ে ফেলে তখন নৌকার যাত্রীদের প্রায় তাদের ভিড়ে ডুবিয়ে দেয়…এবং এদের গ্রাস করতে ছুটে আসে সাপ শুশুক হাঙর এবং বড় বড় মাছের দল—জল তোলপাড় করে…সে অবস্থায় নৌকা সামাল দেওয়া অসম্ভব। আর এরকম একটা আধটা দল এক আধবার যদি আসে তো সামলানো যায়…কিন্তু বর্ষার পর এরা আসে দিনে তিনবার চারবার করে…পাহাড়পরিমাণ উঁচু হয়ে জড়ো হয় সারা বোটে—মানুষের চোখে মুখে নাকে কানে হাতে কাঁধে সারা শরীরে ছেয়ে যায়…এ বড় কম অত্যাচার তো নয়…সে সময় লোকে চোখে কানে দেখতে পায় না—অথচ জলে তখন চলে হুলুস্থুল অভিযান —কাজেই এ অবস্থায় কাকে ছেড়ে কাকে সামলাবে বলুন।

যাই হোক এসব অত্যাচারও সহ্য করে ক্যাপ্টেন টারকি এগিয়ে চলেছিলেন কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখলেন আকাশের মাঝে এক চলন্ত কালো স্তম্ভ !

অবাক্‌বিস্ময়ে ক্যাপ্টেন টারকি আর তাঁর সঙ্গীরা চেয়ে থাকেন সেই চলন্ত কালো স্তম্ভের দিকে···

এ আবার কি ?

চলন্ত স্তম্ভ আকাশের গায় ?···এ যে কল্পনাও করা যায় না !

সূর্যকিরণ পড়ে তা যেন ক্ষণে ক্ষণে কালো থেকে নানা রঙে প্রকাশিত হতে থাকে···ইংরেজীতে যাকে বলা চলে "অরোরা বোরিয়ালিস" (Aurora Borealis)।

হাওয়ায় হেলতে দুলতে সে ধূম্রস্তম্ভ যেন ওঁদের নৌকার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো। হতবাক্ হয়ে ক্যাপ্টেন টারকি চেয়ে থাকেন···ক্রমে ক্রমে নেমে আসে সে ধূম্রস্তম্ভ প্রায় ওঁদের নৌকার সন্নিকটে।

কী যে মাথায় এলো, ক্যাপ্টেন টারকি হঠাৎ তাঁর হাতের বন্দুক আকাশের দিকে তুলে দুম্ দুম্ শব্দে গুলি চালালেন।

কিন্তু এ গুলি যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের নিজেদেরই মরণফাঁদ হয়ে আকাশ থেকে নেমে আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

গুলির আঘাতে ধূমল স্তম্ভটি চুরচুর হয়ে আকাশ থেকে ঝুরে ঝুরে পড়লো তাঁদের নৌকারই উপর···প্রায় বিশ গজ পরিধি নিয়ে সেই ধূমল গুঁড়ো সারা নৌকায় ও জলে ঝরঝর করে ছিটিয়ে পড়লো···

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাঝিমাল্লা সহকর্মীর দল চীৎকার করতে শুরু করলো—ওরে মলুম রে গেলুম রে—

ক্যাপ্টেন টারকিরও সেই অবস্থা···

তিনি দেখলেন তাঁর সারা গা রাশি রাশি লাল কাঠপিঁপড়েয় ছেয়ে ফেলেছে···

ধূমল স্তম্ভ যে এক পিপীলিকার স্তম্ভ তা তিনি না বুঝেই এ বিপদ্ ডেকে এনেছেন···

দেখতে দেখতে জ্বালাযন্ত্রণায় তাঁর বোটশুদ্ধ সমস্ত সঙ্গীরা ও নিজে যেন পাগলের মত হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন···কিন্তু সেখানেও রক্ষা নেই, সেখানেও কচুরিপানার মত জট বেঁধে পিঁপড়ের স্তূপ ভাসছে···তারা নিজেদের বাঁচাতে উঠে এলো সাঁতারু মানুষের দলের অঙ্গ বেয়ে···সে কি বিকট চীৎকার ও যন্ত্রণা তা ভাষায় বলা যায় না···

বিষাক্ত পিঁপড়ের জ্বালায় সবাই শেষ পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে যান।

সবাই বলে উঠি—উঃ, পিঁপড়ের অত বিষ ?···সে পিঁপড়ের নাম কি ?

মাখন সিং বললেন—সেগুলোর নাম "ফরমিয়া নিগরা" (Formia Nigra)।

অনেকক্ষণ এই অভাবনীয় কাহিনী শুনে কথা বলতে পারিনি। স্তব্ধ অন্ধকারে নৌকায়

নোঙর লাগানো হয়েছে···তাই সবাই স্থির···পাশের বড় বড় গাছের মধ্যে থেকে বিকট বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে···সে আওয়াজও যেন এই মুহ্যমান পরিস্থিতির স্বপ্নভঙ্গ করতে পারেনি।

৪

সকলের নিস্তব্ধতা ভেঙে আমিই প্রথম কথা বললাম। বললাম—এরা দেখছি Sleeping Beesএর চেয়েও কম ভয়ংকর নয় !

মাখন সিং বললেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লিভিংস্টোনকে সাহায্য করতে এসে পৌঁছেছিলেন ইংলণ্ড থেকে লেফটেনান্ট ডবলিউ. গ্র্যাণ্ডি···কিন্তু পথ হারিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে লিভিং-স্টোনের দুর্দশা ঘটেছিল স্লিপিং বীজের কাছে···প্রকৃতপক্ষে স্লিপিং বীজের কামড় খেয়ে শেষ পর্যন্ত লিভিংস্টোন মরণ বরণ করেন···১৮৭৩ সালে গ্র্যাণ্ডি এসে পৌঁছে লিভিং-স্টোনের মরণবার্তা ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন, তারপর তিনি নিজেই কঙ্গো নদীর অববাহিকার খোঁজে বার হলেন।

প্রশ্ন করলাম—কঙ্গোর অববাহিকা নিয়েই বা এঁরা এত মাথা ঘামাতে শুরু করে-ছিলেন কেন ?

হেসে মাখন সিং বললেন—কঙ্গো নদীর অববাহিকা ধরেই আজকের গোল্ড কোস্টের সোনা যোগান চলেছে···তাছাড়া বন্য সম্পদ্···এত সম্পদ্ কোথায় পাবে বলুন,···টিন রুপার গোল্ড হীরে হাতীর দাঁত···সমস্ত সম্পদ্ এই অঞ্চল ঘিরে যে। হ্যাঁ যা বলছিলাম···ঘুমপাড়ানী মাছির কামড়ে যে বিষ আছে তা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়···তাইতো প্রতিটি জনপদে ঢোকার আগে লেখা দেখলেন—Beware of Sleeping Bees ··Don't Enter···কিন্তু যাঁদের অভিজ্ঞতার ফলে আজকের এই লেখা তাঁদের অভিযানে কি অসম্ভব সাহসিকতা ছিল ভাবুন। নইলে এই অজানা অচেনা দেশে বেঘোরে কত লোক না প্রাণ উৎসর্গ করেও অভিযান চালাতে পেছপা হননি।

মনে করুন লিভিংস্টোনই প্রথম আবিষ্কার করেন যে কঙ্গো নদীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে "নাইল নদী"···কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে নাইলের গতি ঘুরে গেছে বটে অ্যালবার্ট লেকের "বুরিজি" থেকে কিন্তু লেকের অন্য দিকের বুরিজি থেকে কঙ্গোরও এক ধারার উৎপত্তি।

ভিক্টোরিয়া নাইল ঘুরতে ঘুরতে এসে মারচিসন প্রপাত সৃষ্টি করে নদীপ্রবাহে এসে মিশেছে লেক অ্যালবার্টে···এবং অ্যালবার্টের একদিকের ভগ্ন স্রোত যেমন হোয়াইট নাইল সৃষ্টি করেছে তেমনি অপরদিকের ভগ্ন স্রোত কঙ্গো নদীরও সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে···এই দুটি মোহনাকেই দেশী ভাষায় বলা হয় "বুরিজ"।···

এই বুরিজির সন্ধান প্রথম দিয়েছিলেন ডেভিড লিভিংস্টোন।

মাখন সিংএর গল্প শুনতে শুনতে সবাই ঢুলতে শুরু করেছে···রাতও প্রায় দুটো বেজে গেছে···মাঝিমাল্লারা আর বয়রা যে যার পাশের সেগুতের পিঠে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছে···খালি আমার চোখেই ঘুম নেই···ভাবছি কথায় কথায় ভোর হলেই বাঁচি···ঘুমুলে যদি নতুন কোন বিপদ্ এসে উপস্থিত হয় তাহলে ?

মাখন সিং বললেন—এবার শুয়ে পড়ুন মিঃ বোস···কাল সকালে সেমলিকি নদীর অববাহিকা ধরে যাত্রা শুরু করতে হবে···দু'পাশে আপনি অজস্র জিনিস পাবেন যার ছবি তোলা একান্ত প্রয়োজন।

ঘুম আমারও পেয়েছিল···ঘুমে ঢুলে পড়ছিলাম কিন্তু তার পেছনে অজানিত আতঙ্ক আমায় ঘিরে ধরেছিল, তাই ঘুম এলেও ঘুমুতে পারছিলাম না। বললুম—এ গল্পগুলো আমার পক্ষে শুধু সময় কাটানো নয় মিঃ সিং··· এগুলো ভাল করে বুঝে জানতে পারলে সুটিং করার সুবিধা হয়···তাছাড়া এসব জায়গার জিওগ্রাফি আর কোথায় কি পাওয়া যায় জানলে ছবি তোলার প্রোগ্রামটাও নিখুঁত হয়···তাই যদি আপনার ঘুম না পেয়ে থাকে তো আমায় কঙ্গো সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন···বিশেষ করে সেই অঞ্চলের যে অঞ্চলে পিগমীদের বাস। (ক্রমশঃ)

বলো তো কাকটা হাঁ করে কি দেখছে।

কাকটা হাঁ করে কি দেখছে বলো তো। না পারলে ১ থেকে ২-৩ করে ৪১ অবধি দাগ টানো।

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাখন সিং একটু চুপ করে থেকে বলেন—বেলজিয়ান কঙ্গোর ঠিক নিশানা বলতে গেলে একটু গুছিয়ে বলতে হয়…এতে কঙ্গো নদীরও উৎপত্তির কথা এসে পড়ে…

কঙ্গো বেসিন বলতে এর সবচেয়ে নীচু জলাভূমি হচ্ছে লেক লিওপোল্ড যা সমুদ্র থেকে এক হাজার একশ ফুট উঁচু…আর এর আশপাশের উচ্চতায় বড় বড় পাহাড়। পশ্চিমে ক্রিস্টাল পর্বতমালা…এর একের পর এক শিখরগুলো গেলারির মতো উঠে গেছে দক্ষিণে অ্যাঙ্গালো প্লেটো যেখান থেকে কঙ্গো নদীর প্রধান স্রোত বার হয়েছে…এর নাম হচ্ছে 'কাসাঈ'…আবার উত্তর-দক্ষিণে কাতাঙ্গার পাহাড়…যে কাতাঙ্গার পাহাড় তামার জন্যে বিখ্যাত…এর থেকেও বহু ঝরনা নেমে কঙ্গো নদীকে বলিষ্ঠ করেছে…আর পূর্বদিকে অর্থাৎ যে অঞ্চলে আমরা রয়েছি…কঙ্গোর প্রধান স্রোত গতি পাচ্ছে লেক নায়সা ও লেক টাঙ্গানাইকা, এবং তার উত্তরে লেক অ্যালবার্ট নায়েঞ্জা থেকে। এদের ঘিরে রেখেছে মিটুবা পর্বতমালা…এগুলির অবরোধেই গড়ে উঠেছে কঙ্গো বেসিন।

এ পাহাড়গুলির মধ্যে অনেকেরই উচ্চতা দশ হাজার ফুট ছাড়িয়ে—এর উপত্যকার নামই হচ্ছে 'অ্যালবার্টিন রিফ্‌ট্ ভ্যালী' যার মধ্যেই অবস্থান করছে লেক নায়সার কিছু অংশ আর লেক টাঙ্গানাইকা, লেক কিভুই, লেক এডোয়ার্ড আর লেক অ্যালবার্ট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলও উচ্চতায় তিন থেকে চার হাজার ফুট…এগুলির ওপরেই বিটপীসংকুল ঘন বন…আর বিষুবরেখার উপর বলে এই বনসম্পদ্ এত ঘন এত সজীব…এক একসময় এসব বনে এতটুকু সূর্যরশ্মি ঢোকবার সুযোগ পায় না।

টাঙ্গানাইকা লেকের পশ্চিমাঞ্চলে 'ম্যানিয়ামা' দেশের উল্লেখ করতে গিয়ে ডেভিড

লিভিংস্টোন লিখে গেছেন—"এই সব প্রকৃতির আদিম জঙ্গলে কখনও সূর্য তার কিরণকণার এককণাও পাঠাতে সমর্থ হয়নি। দারুণ দ্বিপ্রহরে যেটুকু সূর্যরশ্মি এদের শ্যামঘনপল্লব ভেদ করবার চেষ্টা করে তাও একটা পেন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা যায়।"

পূর্বাঞ্চলে আরুইমি থেকে অ্যালবার্ট নায়েঞ্জার মুখ পর্যন্ত বিস্তারিত জঙ্গল লম্বায় চওড়ায় প্রায় পঁচিশ হাজার স্কোয়ার মাইল হবে…এই চত্বরের কোথায়ও সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না।

এই অসূর্যম্পশ্যা অরণ্যের ঘন অন্ধকার কন্দরেই বসতি করে বিশ্বের বিস্ময় বেঁটেবামন পিগমীর দল। তাই জন্যে এ অঞ্চলের জঙ্গলগুলাকে এককথায় বলা হয় "পিগমী ফরেস্ট" (Pigmy Forest)।

এই জঙ্গলের বিস্তার গিয়ে পৌঁছেছে নাইল-বেসিনের সীমানা পর্যন্ত। রিফ্‌ট্ ভ্যালীর লেক কিভুই, লেক এডোয়ার্ড, লেক অ্যালবার্ট, সেমলিকি নদী, এমন কি রিয়াঞ্জারো রেঞ্জের পিছনদিকটাতেও পিগমীদের গতিবিধি মাঝে মাঝে দেখা যায়…মনে নেই আমরা কয়েক-জনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম 'মারচিশন ফল্‌স্' দেখার সময়। কাজেই সেমলিকি নদীর ধার ধরে এগুলেই পিগমীদের এলাকা শুরু হয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করি— টাঙ্গানাইকার জঙ্গলে যত জিরাফ দেখেছিলাম এ অঞ্চলে অত দেখছি না কেন · অন্যান্য জন্তুর মধ্যে সিংহকেও আমরা এ অঞ্চলে হারিয়েছি।

মাখন সিং উত্তর দেন—সিংহরা যে কারণে এধার মাড়ায় না ঠিক সেই কারণে জিরাফদের দেখা আপনি পাচ্ছেন না…সাধারণতঃ মরুবালির মধ্যেই বেশী দেখতে পাওয়া যায় কয়েকটি জন্তুকে…তার মধ্যে অতি-মরুতে পাই উট, উটপাখী আর জিরাফদের, আর স্বল্প-মরুতে পাই সিংহদের।

জলাকীর্ণ ও বনাকীর্ণ জায়গায় এরা বিশেষ ঘুরতে চায় না। তার উপর জিরাফরা 'মিমোজা'(Mimosa) গাছের পাতাটাই বেশী খায়। সেগুলো জন্মায় মরুপ্রধান জায়গায়। তাই প্রকৃতি জিরাফদের স্বভাবেও জল-না-খেয়ে থাকার শক্তি দিয়েছেন।

এদের তিন তিনটে পাকস্থলী…একটাতে প্রথম গেলা খাদ্যগুলি রক্ষিত থাকে… দ্বিতীয়টিতে খাদ্যগুলি আবার উদ্গার করে জাবরকাটার ব্যবস্থা আর তৃতীয়টি পানীয় সংগৃহীত করে রাখে।

উটেদের মতোই এদের স্বভাব। জানেন তো এদের আর এক নাম 'উটচিতা' (Camelopard)। এদের গায়ের ছাপে থাকে চিতাবাঘের চিত্রবিচিত্র আর গলার কাছটা উটের মতো লম্বা।

গ্রীক বৈজ্ঞানিক গবেষকরা বলে গেছেন যে জিরাফ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তু···সেই সময় চিতাবাঘ ও উটের মিলনের ফলেই এদের জন্ম।

আমি বলি—তাই নাকি? কিন্তু টাঙ্গানাইকার মোশী শহরের আশেপাশে আর মাউণ্ট কিলিম্যাঞ্জারোর উপত্যকাতেও তো দেখেছি এদের।

মাখন সিং বলেন—কেন, এখানেও তো আসার পথে কিছুটা দেখতে পেলেন··· আসলে এরা কাঁটাগাছের হালকা পাতা আর মিমোজা গাছের পাতা খেয়েই থাকে, কাজেই রসনার দায়ে মাঝে মাঝে নেমে আসে···তবে এদেরই সমজাতের একরকম জন্তুরা এই গভীর অন্ধ বনে বাস করে। তাদের দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা—

পিগমীরাই এদের নামকরণ করেছে ‘ওকাপি’ (Ocapi)। আফ্রিকার এই জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী স্যার হ্যারি জনস্টন পিগমীদের কাছ থেকে এই জন্তুর নামটি সংকলন করেন। পরে ইংরেজীতে নাম দেন ‘ওকাপিয়া জনস্টনী’। কিন্তু সে নাম শেষ পর্যন্ত টেঁকলো না···তাইপু রোগো নামেই আজও ওরা পরিচিত।

বিচিত্র এদের গায়ের রং···মুখের দিকটা সাদা···দেখতে অনেকটা জিরাফের মুখ··· অথচ গলাটা অত লম্বা নয়···কানদুটি জিরাফের মতোই খাড়া-খাড়া···গায়ের রং লালচে বাদামী ···পিছনের থাইদুটো থেকে শুরু করে পাদুখানি পর্যন্ত সাদাতে কালোতে আর কমলারঙের ডোরাকাটা···প্রায় জেব্রাদের গায়ের ডোরাকাটার মতো।

জিরাফদের মতো এরাও নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্ত্রী ওকাপিগুলো পুরুষের চেয়েও আকারে বড়···পুরুষ ওকাপির মাথায় শিং থাকে তবে খুব ছোট ছোট।

এদের জিবগুলো এক হাতের ওপর বেরিয়ে আসে···এই জিবের সাহায্যেই লতাপাতা টেনে ছিঁড়ে খায়।

এতটুকু শব্দে এরা সচকিত তাই এদের ধরা অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব বস্তুকে সম্ভব করতে পারে একমাত্র পিগমীরা। কথায় বলে না রতনে রতন চেনে···তাই অতিধূর্ত পিগমীরা এদের ধূর্তামি ধরে ফেলে। পিগমীদের ‘ওকাপি’ হচ্ছে একটি উপাদেয় খাদ্য··· যদিচ মানুষের মাংসই এদের সবচেয়ে উপাদেয় তবু ওকাপির মাংসও তার পরই।···আমাদের যেমন মাটনের চেয়ে মুরগী ভাল লাগে এদেরও তেমনি ওকাপির চেয়ে মানুষের মাংস ভাল লাগে। তাই এরা মানুষকে একলা পেলে সব জন্তু ছেড়ে তাকেই চেপে ধরে।

বেলজিয়ান রুলিং আসার পর বন্দুকযন্ত্রের ঠেলায় এরা মানুষকে কিছুটা রেহাই দিয়েছে তবে একলা নিরালা পেলেই শেষ করে দিয়ে দেহ নিয়ে পালায়। ভাবুন, আজকাল মানুষের মাংস জোটাতে পারে না বলে নিজেদের মড়াকে নিজেরাই রোস্ট বানিয়ে খায়।

আমি বলি—কি ভয়ানক!

মাখন সিং বলেন—ভয় পাচ্ছেন নাকি, তবে এদের ছবির স্যুটিং কি করে করবেন? হাহা করে হেসে ওঠেন মাখন সিং।

আমি চুপ করে থাকি।

উমি বলেন—কী ভাবছেন···এদের নিয়ে ছবি তোলা যে মরণবাঁচন সমস্যা, তাই না?

আমি বলি—না তা নয়, তবে এই অন্ধ-অরণ্যে বিনা আলোয় কি করে কি করবো তাই ভাবছি।

মাখন সিং বলেন—আমি বুটিয়ারা থেকে রণমলভাইকে খবর পাঠিয়ে রেখেছি ওদের সর্দারকে দাদন দিতে। সর্দারই ওদের এনে নাচাবে কোঁদাবে—এতে আমাদের ভয়ের কারণ নেই। বুনো জঙ্গলের পিগমীদের আক্রমণ বাঁচিয়ে চলতে হবে···তবে এদের নিয়ে ভয়ের কারণ নেই কারণ এদের দলপতিই এদের জামিন দাঁড়াবে। আর এই অন্ধ-অরণ্যের বাইরে আলোকোজ্জ্বল জায়গাতেই এনে এদের দাঁড় করাবে।

আমি বলি—বন্যদের বনের বাইরে ফাঁকা এলাকায় কেমন যেন মানায় না···স্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝেই এদের ভাল লাগে। তাই নয় কি সর্দারজী?

কথায় কথায় রাত তিনটে বেজে গেছে—ভোরের বাতাস ছেড়েছে তখন···গাছের পাতায় শিরশির শব্দে যেন বাজছে ঘুমপাড়ানী গান···আমি এবার সত্যিই ঘুমালাম··· জানি না মাখন সিং পাহারায় বসে ছিলেন কি ঘুমুলেন।

৫

বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললাম। বন্দুকের আওয়াজে চমকে উঠে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। সামনেই দেখি মাখন সিং বন্দুক-হাতে বোটের কিনারে দাঁড়িয়ে তাগ করছেন···আবার আওয়াজ···আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন—গুড মর্নিং···লেকে বালহাঁস শিকার করছি···

সকাল সবে পাঁচটা কিন্তু সূর্যকিরণে চারিদিক যেন ঝলমল করছে···লেক এডোয়ার্ডের যেখান দিয়ে আমাদের নৌকা আস্তে আস্তে জল বেয়ে চলেছে সে জায়গাটাকে বাংলাভাষায় বাদা বললেও চলে। জলের মধ্যে জোলো উইডগুলো যেন সারা লেক ব্যেপে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে···তারই ডগ বেয়ে বেয়ে নৌকা চলেছে।

বাদা ঘিরে রাশি রাশি বালহাঁসের ঝাঁক জলে গা ভাসিয়ে দুলছে···তাদের গায়ে সূর্যকিরণ পড়ে ঝিলমিল করছে···রাতের আতঙ্ক যেন প্রভাত-সূর্যে ধুয়ে মুছে গেছে, তার অবলেশ পর্যন্তও নেই। মনেই হয় না গতরাত্রের প্রতিমুহূর্তের সেই ত্রস্ত অভিযান।

লেকের জলে মুখ-হাত ধুয়ে সর্দারজীর পাশে দাঁড়িয়ে গরম কফিতে চুমুক দিলাম। সর্দারজী বললেন—দশটা বালহাঁস শিকার করা হয়েছে···দেশীয় বয়রা একটা লগির ডগায় অদ্ভুত ধরনের জাল বেঁধে সেগুলোকে জল থেকে সংগ্রহ করছে···

জিজ্ঞাসা করলাম—সেমলিকির মোহনা আর কতদূর?

সর্দারজী বললেন—প্রায় এসে গেছি···

পাশেই বেন্নারার জঙ্গলের শেষ সীমানা। উঃ কি ভয়ংকর জঙ্গল এই বেন্নারার! পদে পদে বিপদ্ যাকে বলে তা এই জঙ্গলে পা দিলেই বোঝা যায়। দু'পাশে কাঁটাবন, তারই মধ্য দিয়ে সরু পথ—ওপরের মহীরুহ বনস্পতির ছায়ায় পথ অন্ধকার···আবার তার ওপর পায়ের তলায় ব্লাক কটন্ সয়েলের কাদামাটি। মাটিতে গামবুটের অর্ধেক পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ডুবে যাচ্ছিলো। মনে করলেই কেমন গা ছমছম করে। এই সব বনেই দু'শিঙ-ওয়ালা আফ্রিক্যান গণ্ডারের বাস। কাল সারাটা দিন এই জঙ্গলে ঘুরে মরেছি কিন্তু তাদের দেখা পাইনি···পাশের বনের কাঁটা ফুটে মিঃ ব্যানার্জীর হাতটা আজও ফুলে রয়েছে···

আজ দু'দুটো এসে দাঁড়িয়েছে লেকের তীরে···

মাখন সিং হঠাৎ বলে ওঠেন—মিঃ বোস, কাল যাদের জন্য আমাদের এত খোয়ার আজ দু'দুটো এসে দাঁড়িয়েছে লেকের তীরে···দেখুন পারেন তো ফোটো তুলে নিন।

সুধীরকে (আমাদের ক্যামেরাম্যান) বললুম—কিগো পারবে এত দূর থেকে ছবি ওঠাতে?

ও বলে—টেলিফোটো লেন্সটা লাগিয়ে দেখে নিচ্ছি—

ক্যামেরা যথাযথ ফিট করে সুধীর ক্যামেরায় চোখ দিয়ে বললো—আরও একটু কিনারের কাছে গেলে সুন্দর শট্ হয়···

নৌকা কিনার ধরে প্রায় বিশ গজ দূরে এসে হাজির হলো—গণ্ডারদ্বয় এখন বাদার কাদায় পড়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আদর-সোহাগ জানাচ্ছে···আমাদের ক্যামেরা চললো ঘরঘর শব্দে—সুধীর বললো—O. K.

মাখন সিং বলেন—এরাই হচ্ছে Double-Horn Rhino...আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এদের সন্ধান পাবেন না।

ব্যানার্জী বলেন—কেন, ভারতবর্ষে আসামের গণ্ডারও এক-একটা কম নয়। একবার আসামের এক টানেলের মধ্যে দুটি গণ্ডার ঢুকে খেলা করছিল···টানেল থেকে তারা আর বেরোয় না—এদিকে ট্রেন এসে প্রায় ঘণ্টা তিনেক টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে হুইস্‌ল্ দিচ্ছে···কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—কে কার কথা শোনে। আসাম রেলওয়েজএর ইতিহাসে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে···

মাখন সিং বলেন—ইণ্ডিয়ান রাইনো সাইজে খুবই বড় তবে এদের মতো ডব্‌ল্-হর্ন নয়···তাছাড়া এগুলোর মতো অত জংলীও নয়···

আমি হেসে উঠলাম, বললাম—জঙ্গলের জানোয়ার জংলী হবে না তো আর কি জেণ্টলম্যান হবে?

* * *

অদূরে সাত-আটটি কিবাকো অর্থাৎ জলহস্তী নদীর কিনারে উঠে বড় বড় ঘাস ছিঁড়ে মুখে পুরছে এবং চক্ষু বুজিয়ে চিবিয়ে যাচ্ছে···এদের রূপ দেখে মনে হয় না রাতের বিকট হাসি আর উল্লাসকারক জীব ছিল এরাই···মনে হয় না জলের মধ্যে হাঁপাই ছুঁড়ে জলোচ্ছ্বাস-সৃষ্টিধর এরাই ছিল···এরা যেন খাটালের বড় বড় মহিষ···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে···

মিঃ ব্যানার্জী বলেন—দেখুন মিঃ বোস, জঙ্গলের জানোয়ার হলেও এরা কেমন জেণ্টল-ম্যানের মতো সকালের breakfastএ ব্যস্ত।

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

ব্যানার্জী বলেন—আচ্ছা সত্যি বলুন, এদের এরকম দেখে একবারও কি মনে হয় যে এরা ভীষণ বা ভয়ংকর?

মাখন সিং মৃদু হেসে বলেন—এইতো লাস্ট ইয়ারের আগের ইয়ারে এসেছিলেন একদল শ্বেতাঙ্গ শিকারী···তাঁদের নিয়ে আপনাদেরই মতো সেমলিকি নদী ধরে কঙ্গোর মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম শিকার করতে। লেক এডোয়ার্ডের সেমলিকি নদীর সঙ্গমস্থল ছাড়ালেই আপনারাও দেখতে পাবেন যে নদীর প্রখরতা যেন আদবে নেই···তার কারণ সেমলিকি নদীর উৎপত্তির নীচে এডোয়ার্ডের গভীরতা প্রায় অতলস্ত বলা যায়—এ গহবরের উপরন্তু জল নিকাশ নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সেমলিকি নদী···মারচিশন ফল্‌স্‌এর রিভারমাউথের মতো এও

তাই স্থির একটানা বয়ে যাওয়া জল রিভারমাউথের মতোই। এখানে বাস করে অঢেল জলহস্তী আর কুমীর। তবে রিভারমাউথের সংখ্যার চেয়ে এ অঞ্চলে ওদুটোর বসতি আরও বেশী··· এককথায় বলা যায় সেমলিকির আসল স্রোত আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত এই দুই প্রাণীই আপার সেমলিকিতে গিজগিজ করছে।

এ অবস্থা দেখে তো শ্বেতশিকারী দলের আনন্দ আর ধরে না··· তাঁদের ইচ্ছা কিছু কুমীর শিকার করে চামড়া সংগ্রহ করবেন···কিবাকোদের তাঁরা ঘাঁটাতে চান না, কাজেই তাঁদের নিশানা তীরের কুমীরের ওপরই বেশী।

—কিবাকোদের ঘাঁটাতে চান না কেন?

—ওঁরা বলেন, কি দরকার ওদের ঘাঁটিয়ে···ওদের ঐ বৃহৎ শরীরের চামড়া নিয়ে আমরা ফেসাদেই পড়ে যাবো, তাকে ছাড়ানো, ট্যান করা, কিবাকো স্টিক তৈরি করানো··· এমনিতর বহু লেঠা। তার চেয়ে crocodileই ভালো।

আমি বললাম—আচ্ছা, বাই দি বাই, কিবাকো স্টিকটা কি?

—কিবাকো স্টিকটা কি জানেন না···তবে শুনুন। রাইনো আর জলহস্তী অর্থাৎ কিবাকোর চামড়ায় খুব ভালো স্টিক তৈরী হয়···আসলে ওদের গায়ের খাঁজের মোটা চামড়া স্টিকের মতো লম্বা করে কেটে নিয়ে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে একেবারে ওপেগ করে ফেলে ···এবং সেগুলো তখন শক্ত হুইপের মতো স্প্রিং করতে থাকে···এইগুলো থেকে স্টিক-আকারে লাঠি বানায়। কিন্তু রাইনো স্টিকের লাইসেন্স দরকার হয় তবে কিবাকো স্টিকের লাইসেন্স নেই।

—লাইসেন্স···কিসের লাইসেন্স?

—পুলিসের লাইসেন্স দরকার হয় রাইনো স্টিকে কারণ ওগুলো poisonous অর্থাৎ বিষাক্ত···মানে ঐ স্টিকের বাড়ি কাউকে মারলে চাবুকের মতো তা গায়ে বসে গিয়ে দাগড়া দাগড়া হয়ে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ে···রাইনোর চামড়ায় বিষ আছে বলে কাটা জায়গাগুলো ঘায়ে পরিণত হয় এবং সে ঘা কখনও শুকায় না বরং ক্রমে ক্রমে সে বিষাক্ত ঘা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অবশেষে মৃত্যু ঘটায়। তাই, এই রাইনো স্টিকের লাইসেন্স দরকার হয় যেমন লাইসেন্স দরকার হয় fire arms এর।

কিন্তু কিবাকো স্টিকে কেটে গিয়ে ঘা হলেও তা বিষাক্ত নয় বলে লাইসেন্স দরকার হয় না।

যাক যা বলছিলাম। শ্বেতাঙ্গ শিকারীরা রিভারমাউথে ঢুকেই দুজন দুটি কুমীরকে আলাদা আলাদা ভাগ করলেন এবং নিমেষে গুলিবর্ষণ করলেন··অব্যর্থ নিশানায় সত্যই দুজনে দুটি কুমীরকেই জখম করলেন···

জখমী কুমীরদ্বয় দশ ফুট উঁচুতে লাফ দিয়ে জলে গিয়ে আছড়ে পড়লো ···পড়লো তো পড়লো একেবারে হুড়মুড় করে দু'দুটো উল্লাসকারী কিবাকোর ঘাড়ের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে নদীতে উঠলো যেন এক তুফান···উঃ সে কী দৃশ্য··· হিপোদুটো ফিউরিয়াস হয়ে কুমীর-দুটোকে হাঁ করে মুখে চেপে ধরতে গেল···একটা কোনোক্রমে পিছলে পালালো, বাকিটাকে নিয়ে কিবাকো-দুটো যেন মুখ থেকে মুখান্তরে লোফালুফি করতে লাগলো···কুমীর যত ল্যাজের ঝাপটা দেয়, হাঁ করে মুখব্যাদান করে ওরা ততই ক্ষিপ্ত হয়ে কুমীরটাকে ওদের বিরাট চোয়ালে ফেলে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ছেড়ে দেয়।

জখমী কুমীরদ্বয় দশ ফুট উঁচুতে লাফ দিয়ে জলে গিয়ে আছড়ে পড়লো··

জল তো কুমীরের রক্তে লাল হয়ে উঠলো কিন্তু কিবাকোদের চাপা গর্জন থামেও না আর মরণাপন্ন কুমীরপুঙ্গবকেও ছাড়ে না···প্র্যাকটিক্যালি কুমীরের ঐ মোটা স্কিনটাকে ওদের দাঁতের চাপে টুকরো টুকরো করে দিল···শেষ পর্যন্ত কুমীরটা মরে গিয়ে চিত হয়ে ভেসে উঠলো···তার দিকে খানিক ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কিবাকোদুটো জলে ডুব দিল···বুঝুন কেমন জেণ্টলম্যান আপনাদের জানোয়ারটি।

বসে বসে ভাবছিলাম···বনেজঙ্গলে কত রকমের কত আশ্চর্য কাণ্ডই না ঘটে চলেছে···এক জন্তুর অপর জন্তু থেকে বাঁচবার কত রকমই না প্রয়াস!

কুমীর মাংসাশী আর জলহস্তী নিরামিষাশী···দুটিতে একই সঙ্গে জলে বাস করে অথচ কেউ কাউকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে না। ডাঙার মানুষ ধরে কুমীররা খায় কিন্তু কিবাকো ধরে ধরে খাচ্ছে—এ গল্প কই শোনা যায় না তো!

ভাবি শক্তির কাছে সবাই পরাস্ত···কিবাকোর যদি কুমীরের থেকে শক্তি কম হতো তাহলে নিশ্চয়ই ওরা কিবাকোদের ধরে ধরে খেতো।

বললাম—অদ্ভুত তো···অথচ হিপোরা নিরামিষাশী, কিন্তু কামড়ে ছিঁড়ে কুমীরটাকে জলে ফেলে দিল, খেল না—ভারী রোম্যান্টিক······তারপর শ্বেতাঙ্গ শিকারীরা মরা কুমীরটাকে জল থেকে টেনে তুললেন ?

তুললেন বৈকি···তাইতো দেখা গেল যে কুমীরের ঐ শক্ত চামড়াও কিবাকোর দাঁতের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে···আশ্চর্য না···flat-teethed animal হচ্ছে কিবাকোরা তবু দাঁতের কি জোর !—মাখন সিং বললেন।

ব্যানার্জী বলেন—আচ্ছা, canine-teethed animalমাত্রই বোধহয় মাংসাশী ?

—মাংসাশী তো বটেই···আর flat-teethedরা হয় নিরামিষাশী তবে মানুষ ফ্ল্যাট-টীথ্‌ড্‌ অ্যানিম্যাল হয়েও মাংস খেতে ছাড়ে না—এইটা Fricks of Nature. Natureকে study করলে যা পাই আমরা, তাতে মানুষ কি করে রাক্ষস হলো তা জানতে পারা গেল না···অথচ এই আদমখোররা আসলে মানুষই তো !··গরিলা, সিম্পাঞ্জ বেবুন, ওরাংওটাং, হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী সবাই flat-teethed animal···এদেরও দুটো করে ওপর নীচে চারটে canine teethও আছে··তেমনি মানুষেরও···এরা সবাই নিরামিষ খায় অথচ মানুষ মাংস খাবেই খাবে। আদিবাসীরা মানুষ পর্যন্ত খেতে ছাড়ছে না আর সভ্যেরা মানুষ ছাড়া সব মাংসই উদরস্থ করছে···ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

৬

সেমলিকি নদীর মোহনায় এসে প্রায় পৌঁছে গেছি···দু'দুটো নয়না ভিরাম দৃশ্য দেখে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি···

নদীর দু'পাশে হাজার হাজার 'পিকক-পিজিয়ন' পাখী মাথার সোনার ঝুঁটি দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে··

ইউগাণ্ডার পথে লেক নকরুতে যেমন লালপদ্মের মতো দেখেছিলাম শত শত গোলাপী ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক।

পিকক-পিজিয়ন তোমরা হয়তো জু গার্ডেনেও দেখে থাকবে···এদের নীচের দিকটা ঠিক ময়ূরের মতো···গায়ের রং নীলাভ···পেটের কাছটা সাদা·· সারসের মতো লম্বা গলা··· মুখখানা ঠিক ময়ূরের মতো···আর মাথায় কাঁচা সোনা রঙের পালকের গুচ্ছ·· অপরূপ রংমাধুরীতে ভগবান্ এদের গড়েছেন···

দ্বিতীয়টি হচ্ছে নদীর পূর্ব তীর ধরে হঠাৎ ঝলসে উঠেছে মাউণ্ট অব দি মুনের সূর্যকিরণোজ্জ্বল প্রতিভাত রূপালী তুষারমুকুট···যতদূর দৃষ্টি যায় রিয়াঞ্জারো রেঞ্জের

বরফকিরীট যেন এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বিস্তার করে রয়েছে···তারই মধ্যে তিন-তিনটে শিখরচূড়া যেন মুকুটশীর্ষের উপর হীরকখচিত কারুকার্য বলে মনে হচ্ছে।

রিয়াঞ্জারোকে আমরা আগে দেখেছিলাম ইউগাণ্ডা থেকে আসার পথে মাউসামিট আর ইকোয়েটর থেকে···এখন দেখছি ঠিক তার উলটো দিক থেকে। রিয়াঞ্জারোর অত্যুজ্জ্বল ছায়া এসে পড়েছে নদীর জলে···নৌকার দোলনের সাথে সে ছায়া অল্প দুলছে··· বনসম্পদে সবুজ বিটপীর ছায়ার মাঝখানে এই রজত-প্রতিচ্ছবি যে কত সুন্দর তা নিজে চোখে না দেখলে কথায় বা ভাষায় বোঝানো যায় না।

মাউণ্ট কিলিমাঞ্জারো দেখেছি···মাউণ্ট কেনিয়া দেখেছি···তাদের ছবিও তুলেছি ···আবার মাউণ্ট অব দি মুনকেও দেখেছি অপর দিক থেকে···কিন্তু সেমলিকি নদীর ওপর থেকে চাঁদের পাহাড়কে যে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে তা সত্যিই ভাষায় বোঝাতে পারছি কিনা জানি না···

রিয়াঞ্জারো সম্বন্ধে আগেই বলেছি···এখানকার বাসিন্দাদের কথাও জানিয়েছি··· এবার জানাবো এপাশের বাসিন্দাদের কথা অর্থাৎ পিগমীদের··সেমলিকি নদীর কিনার ধরে অদূরের ঐ অন্ধ-অরণ্যকন্দরেই ওদের বাস।

এবার আমরা চলেছি বিষুবরেখার ওপর দিয়েই বলতে পারি···লেক এডোয়ার্ডের তলা দিয়ে সাবমেরিনের মতো পাহাড়ী লাইন ছুটে চলেছে···স্বচ্ছ কাঁচের মতো জলের মধ্যে দিয়ে তা দেখা যাচ্ছে··আর দেখা যাচ্ছে নানাজাতের মাছ···

বললাম—সর্দারজী, জন্তুজানোয়ার কীটপতঙ্গ সাপখোপ কুমীর জলহস্তী সবই দেখছি এ অঞ্চল ঘিরে যেমন বিদ্যমান তেমনি জলে মাছও তো দেখছি বিভিন্ন রকমের।

সর্দারজী বলেন—এ জলের মাঝে হিপো, কুমীর ছাড়াও পাবেন বড় বড় গোসাপ (lizard), কচ্ছপ, বড় বড় শামুক···শুধু পিকক-পিজিয়ন দেখে উল্লাস করছেন, এখানে পাখীদের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতে পাবেন কঙ্গোর বিখ্যাত কাকাতুয়া···এ কাকাতুয়া সিঙ্গাপুরী কাকাতুয়ার মতো সাদা বা গোলাপী নয়, এদের দেখতে ছাইরঙের তবে মাথাটা আর ঠোঁটটি লাল। এদের মতো কথা কইতে পাখীজগতের কোনো পাখীই নেই···মানুষের মতো অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা ওদের রয়েছে···

আমরা বলে উঠি—জানি, তার পরিচয় মিঃ একম্যানের বাড়ির কাকাতুয়ার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম যখন বাড়ির সামনের আঙুর গাছ থেকে আঙুর তুলতে গিয়েছিলুম।

সিং সাহেব বলেন—কেন, কি হয়েছিল ?

হেসে বললাম—অবিকল মানুষের স্বরে বললে— Don't pluck it.

হেসে উঠলেন মাখন সিং। তারপর বলেন—এ ছাড়া পাবেন হর্নবিলস্, মাছরাঙা,

ওসপ্রেস্, হেরনস্, ক্রস্‌বিলস্, কারলুম, উড্‌পেকার (কাঠঠোকরা), বিভিন্ন বর্ণের, রঙিন ঘুঘু, রঙিন পারাবত, স্টর্ক, পেলিক্যান, সোয়ালোজ, শকুন, বাস্টারক্রেটার, Spur plover. এ পাখীটা অবশ্য প্রায় rare হয়ে উঠেছে।

মাছের কথা বলছিলেন—এখানে ফ্লাইং ফিশ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় যা সমুদ্রে ছাড়া প্রায়ই দেখা যায় না। আর কীটপতঙ্গের কথা তো বলেই শেষ করা যায় না···যেমন ধরুন —স্লিপিং বীজ, বিভিন্ন জাতের বিষাক্ত পিঁপড়ে, কালো মাকড়শা, রাক্ষুসে মাকড়শা, তাছাড়া ম্যালেরিয়ার বিখ্যাত মশা 'অ্যানোফেলিস' আর 'স্টেগোমিয়া' (Stegomia) মশা যা সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর এবং ভীতিজনক···এগুলোর গায়ের রং সাদাতে কালোতে···এদের বিষেই হয় yellow fever যা জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছে আমেরিকার Panama খাল তৈরীর সময়। লক্ষ লক্ষ লোক এদের কামড়ে পীতজ্বরের করালগ্রাসে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মশা পীতজ্বর-সৃষ্টিকারী বিষাক্ত জীবাণু রোগীর দেহ থেকে রক্তের সঙ্গে নিজের দেহে টেনে নেয়, তারপর সেই বীজাণু অন্যকে কামড়ে তার শরীরে সেই বিষ ঢেলে দেয়।

এ রোগের কোনো ওষুধ নেই তাই Sleeping Bees আর Stegomia হচ্ছে আফ্রিকায় সাক্ষাৎ যম Brothers.

আমি বলি—এখানে কে যে যম অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার নয় বোঝা ভার।···কথায় বলে যেদিকে ফিরাই আঁখি দেখি শুধু যম-দূত দল···

সকলে হোহো করে হেসে ওঠেন··· (ক্রমশঃ)

সূর্য ঘড়ি বা সূর্য দিগ্‌দর্শন—

প্রথমে তিনটে কাঠি নাও। একটা কাঠি মাটিতে পোঁত। কাঠিটা যেন তিন ফুট উঁচুতে থাকে। সূর্যের কিরণে কাঠির যে ছায়াটা মাটিতে লম্বা হয়ে পড়বে তার মাথায় একটা কাঠি পোঁত। আবার দশ মিনিট বাদে যেখানে ছায়াটা সরে যাবে সেখানে একটা কাঠি পোঁত। এইভাবে সূর্য ঘড়ি তৈরী হয়ে যাবে। কম্পাস করতে হলে, ছোট দুটো কাঠির মাঝে একটা লম্বা রেখা টেনে যোগ কর। এইবার সেই রেখার ঠিক মাঝখান থেকে লাঠি অবধি একটা লাইন টান। এই লাইন সোজা উত্তরে টেনে গেলে উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণদিকে টান দিলে দক্ষিণাঞ্চল বোঝা যাবে।

বিষুব রেখার অন্তরালে
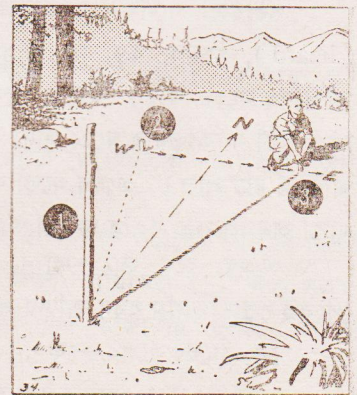
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

হঠাৎ মাখন সিং হাসি থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—ঐ দেখুন ঐ দেখুন লিজার্ডের পাল…জল থেকে উঠে কেমন করে বনের মধ্যে দৌড়চ্ছে—

দেখলাম নদীর সৈকত ধরে প্রায় দশ-বারটা গোহাড়গিলে সাপ সাঙ্গোপাঙ্গ বাচ্চা নিয়ে দৌড়চ্ছে…

সৈকতে চরছে নীলগাই আর মৃগনাভি (অ্যান্টিলোপ) হরিণের দল। বোটের সংগীত শুনে সচকিত হয়ে আমাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

সুধীর ক্যামেরাটা দিয়ে এদের ছবি নিচ্ছিলো, বললাম—এর আগে পিকক-পিজিয়নদের ছবি নিয়েছ ?

সুধীর বললে—দুটোরই ছবি নিয়েছি…আপনি গল্পে মেতে ছিলেন তাই ছাখেননি…মাউন্ট অব দি মুনেরও ছবি ওঠানো হয়ে গেছে।

আমি বললাম—আর গোসাপগুলার ?

সুধীর বললে—ট্রাই করেছি…দেখি কী আসে…এককথায় কিছুই ছাড়বো না…তবে কতদূর কি হয় তা ডেভেলাপ হলেই বোঝা যাবে। ভাবছিলাম ক্যামেরাটা নীচুমুখ করে জলের তলার ছবি নেবো কি না…

আমি উৎসাহিত হয়ে বলি—নাওনা…

ও বললে—বড্ড হ্যালেশন রয়েছে…ছবি উঠবে না, সবটা আবছা হয়ে যাবে।

আমি মাখন সিংকে জিজ্ঞাসা করি—ক'টা নাগাদ রণমলজীর ডেরায় পৌঁছাব ?

উনি বলেন—বেলা চারটে নাগাদ…

বেলা বারটা বেজে গেছে…খানার ব্যবস্থা হলো…টিন ফিশ আর পাঁউরুটি…তার সঙ্গে মিঠাই বলতে টিন ফ্রুটস্ আর জেলি জ্যাম—আর রয়েছে সত্ত মারা বালহাঁসের রোস্ট।…জমেছে ভালো।

৭

মুখরোচক খাবারের সঙ্গে মুখরোচক গল্প হলেই খাওয়াটা জমে ওঠে।…সর্দার মাখন সিংকে ফর্মে দেখে বললাম—তখন যে আইভরি কোস্টের উল্লেখ করলেন, সেটা হঠাৎ বলে থেমে গেলেন কেন ?…অথচ হাতীর মৃত্যু-গুহার গল্পের সময় তা এতটুকু উল্লেখ করেননি…ব্যাপারটা কি রকম বুঝিয়ে দিন তো…

মাখন সিং বললেন—'গোল্ড কোস্ট'এর গল্প তো জানেন…তার গায়ে গায়েই 'আইভরি কোস্ট'…

আমি বললাম—হ্যাঁ, 'ভয়' গ্রামে নদীতে স্নান করার সময় গোল্ড-ডিগারদের পাল্লায় পড়ে তাদের কাছে গোল্ড কোস্টের কিছুটা ইতিহাস পেয়েছিলাম…তাতে বুঝেছিলাম 'ভল্টা' নদীকে ঘিরেই গোল্ড কোস্ট।

মাখন সিং বলেন—আসলে এই ভয়াবহ আফ্রিকার অন্তস্তলে মানুষ পৌঁছতে পারবে বলে আশাই করেনি…আতলান্তিক কোস্টাল লাইন ধরে যে যতখানি ভেতরে উঁকি দিতে পেরেছিলেন ততটুকুতেই তাঁরা আফ্রিকাকে আলিবাবার মতো দস্যুদের রত্নাগার বলেই স্থির করে নিয়েছিলেন।

পশ্চিম আফ্রিকার গিনি কোস্ট যেটা অশ্বিনি থেকে শুরু হয়ে পূর্বের ভোল্টা নদী ধরে বিস্তারিত তাতেই পর্তুগীজরা প্রথম পেলো সোনার সন্ধান…যদিও এডওয়ার্ড দ্য ফার্স্টের আমলে ইংরেজরাই নাকি প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিল বলে একটা মিথ্যা রটনা চালিয়েছিল…কিন্তু সত্যি যেটুকু পাওয়া যায় তাতে ইংরেজদের আগে নরম্যান বণিকরা ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই জায়গাটাতে সোনার খনি আবিষ্কার করে নামকরণ করে যায় 'এলিমিনা' বা 'লা মিনা' বলে…এরা নাকি পঞ্চাশ বছর ধরে আদিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা চালায়…কিন্তু তার সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না…

পর্তুগালের জন দ্য সেকেণ্ডের সময় এদেশের ওপর একটা এক্স্পিডিশন হয় 'ডিওগো ডি আজামবুজা'কে প্রমুখ করে। এঁর সঙ্গে ছিলেন 'বার্থোলোমিউ ডায়াজ' আর বোধহয় 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস'। ১৪৮১-৮২ সালে কলম্বাস 'এলিমিনা'র পুরো দখল নেন এবং এর নতুন নামকরণ করেন 'সাও জর্জ ডা মিনা'…আরও একটা নাম করেন, সেটা হচ্ছে 'ওরা ডেল্ মিনা' অর্থাৎ 'মাউথ অব দি গোল্ড মাইন্‌স্'…

কিন্তু সেদিন এঁরা জানতেন না যে আফ্রিকার মাটিতে, ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে এই সোনার রাজত্ব বিস্তার করে বসে রয়েছে…তাই গাল্‌ফ্ অব গিনির ৭৮,৮০২ স্কোয়ার মাইলটুকুকেই গোল্ড কোস্ট বলে অভিহিত করে গেছেন…অথচ আপনি নিজে চোখে দেখে গেলেন যে গাল্‌ফ্ অব গিনি থেকে শুরু করে কেনিয়ার 'ভয়' পর্যন্ত সোনার এউঢেউ…তাই হাজার হাজার গোল্ড-ডিগারদের পাহারায় আজ সারা পূর্ব-পশ্চিম আফ্রিকা রক্ষিত…আমার নিজের ব্যক্তিগত অনুমান যে বিষুবরেখার নিকটস্থ জায়গাগুলির সবটুকুতেই এই স্বর্ণ সৈকত প্রতিষ্ঠিত।

ঠিক তেমনি বিদেশী এক্‌স্‌প্লয়টাররা গোল্ড কোস্টের জঙ্গল তদারক করতে গিয়ে আবিষ্কার করল 'আইভরি কোস্ট'…অর্থাৎ জঙ্গলে জঙ্গলে হাতীর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে…জংলীরা সেই হাতীর দাঁত নিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা ফাঁদলো।

১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই পর্তুগীজদের 'দীপ বণিকরা' সর্বপ্রথম এই আইভরি কোস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। আইভরি কোস্ট বলতে বলা চলে ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকান কলোনী, দক্ষিণে গাল্‌ফ্ অব গিনি, পশ্চিমে লাইবেরিয়া এবং ফ্রেঞ্চ গিনি, উত্তরে ফ্রেঞ্চ সুদান এবং পূর্বে গোল্ড কোস্ট।

অথচ এ ছাড়া সারা কঙ্গো ভরতি হাতীর পাল…এদের মৃত্যুআগার…এসবের খোঁজ তখনও বিদেশীরা পায়নি।

১৮৯২ সালে ক্যাপ্টেন বিন্‌গ্গার আইভরি কোস্টের অন্তর্গত জঙ্গল ছেড়ে ক্রমে মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলে প্রথম প্রবেশ করেন। তাই গোল্ড কোস্টের সীমানার পরিব্যাপ্তির মতো আজ আইভরি কোস্টও সারা পূর্ব-পশ্চিমে আফ্রিকার মধ্যে বিস্তার করেছে। প্রথমে আইভরি কোস্টের নাম ছিল 'টুথ্ কোস্ট'…ফ্রেঞ্চ নাম ছিল 'Co te des Dents', আবার কাফ্রীরা বলতো 'কায়া কোয়া কোস্ট'…কারণ এ অঞ্চলে তুলোর ফাইবারের মতো পাঁচ-ছয় স্ট্রাইপযুক্ত কাপড় পাওয়া যেত যাকে ইংরেজীতে বলতো 'the Coast of the Five & Six Stripes'। এই হলো আপনার আইভরি কোস্টের ছোট্ট ইতিহাস।

ইতিহাসের গল্পও শেষ হলো আমরা খাওয়াও শেষ করলাম। হাত ধুয়ে তীরের দিকে চেয়ে বুঝলাম আমাদের নৌকা সেমলিকি নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে…পিছনে পড়ে রয়েছে লেক এডওয়ার্ড আর সামনে আকাশছোঁয়া বনস্পতির মাঝপথ ধরে নদী এগিয়ে চলেছে…এ যেন এক জলপথ অ্যাভিনিউ।

পাশের বনস্পতিদের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ইউক্যালিপটাস আর এলিগেটার পিয়ার গাছ…এলিগেটার পিয়ারকে আবার বলে অ্যাভোকেডো পিয়ার।…এ ফলগুলির

মজা হচ্ছে বড় বড় হুঁকোর খোলের মতো ফল। ফলটিকে ছুরি দিয়ে কাটলে এর ভেতরের শাঁস দেখতে যেন সপেটা ফলের ভেতরের অংশের মতো আর মাখনের মতো নরম; এই অংশ চামচে দিয়ে চেঁচে ঘেঁটে তাতে দুধ আর চিনি দিয়ে খেতে হয়। খেতে সুস্বাদু এবং আয়রন বেশী থাকায় অত্যন্ত উপকারী। এসব অঞ্চলে আম বার মাসই জঙ্গলে জঙ্গলে ফলে থাকে…আনারসও প্রচুর…আনারসগুলো যেমন বড় তেমনি রসাল…পেঁপে কলা এসবও প্রচুর জন্মায় আপনাআপনি।

যেখানে জঙ্গল ঘন হতে ঘনতর হয়ে অদূরের উঁচু পাহাড় পর্যন্ত বিস্তার করেছে সেখানে পাওয়া যায় সিল্ক কটন্, বোমবাক্স, মেহগনি, ইবোনী, ওডাম, কেমউড…এসব গাছ শক্ত শক্ত কাণ্ড নিয়ে মাথা উঁচু করে এমনি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে এতটুকু সূর্যালোক এদের ভেদ করে প্রবেশ করবার সুযোগ পায় না…এ ছাড়া বড় লতা-গুল্ম গাছের মাথা থেকে ঝুলতে ঝুলতে নীচের জমি পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই লতা দড়ির মতো এতই শক্ত যে মানুষ তার সাহায্যে ঝুল খেয়ে বহুদূর পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এলিফ্যান্ট গ্রাসের ভেতর কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করছে…

হঠাৎ বনাঞ্চল দূরে সরে গেছে যেখানে সেখানেই দেখছি রাশি রাশি হরিণ চরছে—তাদের মধ্যে উইল্ডা বিস্ট, হারটি বিস্ট পর্যন্ত রয়েছে…দাঁড়ি-মাঝিদের চীৎকার-উল্লাসে ওরা ছুটে ছুটে দূরান্তে মেলাচ্ছে।

নদীর জল থেকে পাড় ধরে জন্মেছে এলিফ্যান্ট গ্রাস অর্থাৎ হাতীঘাস যা লম্বায় আট থেকে দশ ফুট।

হঠাৎ নজরে পড়লো ওগুলোর ভেতর কি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করছে…নীরব বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

পাশ থেকে মাখন সিং বলেন—দেখুন মিঃ বোস ঐ এলিফ্যান্ট গ্রাসের মধ্যে সাপের রাজত্ব…অবশ্য এরা প্রায়ই জলসাপ…

আমি বলি—এ যে জোঁকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে আর ঘাস বেয়ে বেয়ে উঠে খেলা করে বেড়াচ্ছে!

সর্দারজী বলেন—খেলা করছে না, জলে নৌকার শব্দে নিজেদের বিপদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে…

তারপর মাখন সিং বলেন—এগুলা কিন্তু বিষাক্ত সাপ…তবে কি হর্নড্ আর Puffauderদের মতো বিষাক্ত! তা নয়। তবে এদেরও বিষ আছে—তবে দিন হিসেবে অর্থাৎ শনি মঙ্গলবারেই এরা বিষাক্ত হয়।

মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের কথা…এদেশেও শুনেছি শনি মঙ্গলবার এসব সাপের বিষ জন্মায়…পৃথিবীর সর্বত্রই কি এক নিয়ম?

মিঃ ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করলেন—পাইথনেরও কি বিষ আছে?

মাখন সিং বলেন—পাইথনের বিষ অন্যরকমের…ওদের ঠিক অন্যান্য সাপের মতো ছোবল দিয়েই বিষ ঢেলে দেওয়ার প্রথা নেই…ওদের বিষ ধীরে ধীরে সারা শরীরে সঞ্চার হয়…তাই যেখানে কামড়ায় সেখান থেকে সারা শরীরে পচ ধরে। আসলে ওদের শিকার জন্তুজানোয়ারকে জড়িয়ে ধরে নিঃশেষ করা। ওদের পাকে পাকে এতই শক্তি যে হাতীর শক্তিকেও পরাস্ত করে। তাইতো প্যান্থার পর্যন্ত ওদের শক্তির কাছে ভয়ে কাঁপে।

বিষাক্ত সাপ বলতে আফ্রিকাতে, বিশেষ করে এই কঙ্গো জঙ্গলে কোবরা, হর্নড্ আর পাফ্অ্যাডার। কোবরা আপনারা ভারতেও দেখেছেন কিন্তু এখানকার cobraরা বেশীর ভাগই কিং কোবরা—ছোট কিন্তু ফণাখানা প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি বিস্তার করে। হর্নড্ সাপের ফণায় দেখতে পাওয়া যায় ছোট ছোট দু'পাশে দুটো শিং। তবে পাফ্ অ্যাডারের ফণা নেই বললেই হয়—লিকলিকে জিব বের করে এরা শিকারের গায়ে যেন চেটে দেয়…জিবের আগাটা আলপিনের মতো ফুটিয়ে এরা বিষ নিষ্কাষন করে। এ ছাড়া এদের গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র…কখন যে কামড় বসিয়ে সরে যায় বোঝা যায় না।

আমি বলি—আণ্ড স্নেকগুলা কিরকম?

মাখন সিং বলেন—ওগুলো ফ্লাইং স্নেক। ওরা লম্বায় দেড় হাত পর্যন্ত হয়। দু'ধারের শেষেই ওদের দুটি মুখ। লেজের মুখে আর সুমুখের মুখে ঠেকিয়ে নিয়ে ওরা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ছোটে। এক লাফে বিশ ফুট ত্রিশ ফুট পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে গিয়ে ছিটকে পড়ে। ওদের কিন্তু বিশেষ বিষটিস নেই। তবে সাপমাত্রেই harmful.

আমি বললাম—জঙ্গলে তক্ষক সাপ নেই?

মাখন সিং বলেন—ওগুলো সাপই নয়…ওরা লিজার্ড গ্রুপে পড়ে—তবে reptiles… কিন্তু…

আফ্রিকায় সাপের নদী বলতে ভল্টার থ্রিপয়েন্টের নদী।…থ্রিপয়েন্ট নদী হচ্ছে ভল্টা নদীর সঙ্গে Ankobra আর Prah নদীর সংযোগস্থল। এই আনকোবরা নদীতে নৌকা চালাবার জো নেই…রাশি রাশি সাপ এই নদীতে…নৌকার দাঁড়ে দাঁড়ে সাপগুলো জড়িয়ে যায়…আনকোবরা নদীর তাই আর এক নাম হচ্ছে 'স্নেক রিভার'।

জলের ওপর এবার কিবাকোদের দেখতে পাচ্ছি…

মাখন সিং বলেন—লক্ষ্য করবেন যত এগুনো যাবে ততই কিবাকোর দলের বৃদ্ধি হবে…এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন অগুনতি কুমীর।

সেমলিকির এই অঞ্চলে মেট্রোগোল্ডইন মায়ার টারজানের ছবি তুলতে এসেছিলেন। যিনি টারজানের পার্ট করেছিলেন তিনি এই কুমীর আর কিবাকোদের মধ্যে সাঁতার কেটে গেছেন।

উঃ কি দুর্ধর্ষ সাহস!

মাখন সিং হেসে বলেন—সাহস তো বটেই তবে সাহস ছাড়াও ওঁদের অ্যারেঞ্জমেন্টের তারিফ করতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কিরকম?

উনি বলেন—প্র্যাকটিক্যালি ভদ্রলোককে একটা আয়রন-চেন-কেজের মধ্যে পুরে তবে এই নদীতে ছাড়া হয়েছিল। ভদ্রলোক অদ্ভুত সাঁতারু, ঐ ভারী লোহার জালিকেজ সারাগায়ে পরে সমানে সাঁতরে চলেছেন।

আমি বলি—সেকি! লোহার কেজ গায়ে পরলে তো কেজের ছবি ছবিতে এসে যাবে।

মাখন সিং বলেন—তা হবে…তবে বোধহয় লোহার জাল দিয়ে নদীর মধ্যে নামিয়ে দিয়েছিল।

আমি বলি—ওর ইতিহাস আমি জানি…ওটা ঠিক ওরকম নয়…মারচিশন ফল্সের পথে স্টীমারের কাপ্তেন সর্দার বলবন্ত সিংএর কাছে শুনেছিলাম যে রিভারুম উথ স্যুটিংএও ওঁরা ঠিক এইরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ছিলেন। বলবন্ত সিং বলেছিলেন যে মাছ ধরার মতো লোহার জাল দিয়ে ওঁরা কুমীর ও জলহস্তীদের আটকে রেখে ওদের মধ্যে দিয়ে টারজানকে সাঁতার দেবার পথ করে দিয়েছিলেন—পরে সাঁতারু হিরো সাঁতার কেটে এগিয়ে গেলে ওঁরা জালটাকে তুলে হিপো ও কুমীরদের ছেড়ে দিয়েছিলেন…কিন্তু ওঁদের সঙ্গে জার্মানীর বিখ্যাত হেগেনবেগ সার্কাসের এক্সপার্টরা ছিলেন। বোধহয় এ অঞ্চলেও ওঁদের এনেই ঐরকম ব্যবস্থাই করে থাকবেন।

মাখন সিং বলেন—তাই হবে বোধহয়···তবে আমি নিজে চোখে সাঁতারুকে দেখেছি নির্ভয়ে কিবাকো আর কুমীরদের মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

আমি বললাম—কি জানেন, মেট্রোগোল্ডইন কোম্পানি সারা জগৎ ব্যেপে ব্যবসা করেন···আমাদের ছবির ব্যবসার কতটুকুই বা স্থান···কাজেই অর্থ-সামর্থ্য দুটোই অপ্রচুর···আর প্রাচুর্য থাকলেও আমাদের ওঁদের মতো অত নিখুঁত ব্যবস্থাপনা কোথায়?···মনে করুন নৈরবীর জোনস্ অ্যাণ্ড জোনস্ কোম্পানি ওঁদের জন্য বার মাস সারা ঈস্ট আফ্রিকা ব্যেপে ক্যামেরামান বসিয়ে রেখেছেন যাঁরা নিত্য নতুন জঙ্গলের বাস্তব ঘটনার শট তুলে সংকলন করে চলেছেন। এই সব বাস্তব শট এডিট করে যখন স্টুডিও শটের সঙ্গে মেশে তখন তা ভালো না হয়ে যায় কোথা। আমাদের ভারতবর্ষে কে এমন প্রডিউসার আছেন বলুন যিনি বার মাস রাশি রাশি টাকা ঢেলে এক্সপার্ট রেখে এই সব ব্যবস্থা করবেন?

কথা বলতে বলতে যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেখলাম যেন একটা উপবন···

জায়গাটা ঘিরে বড় বড় পামগাছের সুন্দর এক বন্য উদ্যান···ব্যাপার কি···এই জঙ্গলে এগুলিকে কে এমন করে রোপন করেছে?

মাখন সিং বলেন—এগুলি Sago Palms. এদের মাথার সবুজ কাণ্ড চিরেই সাগুদানা পাওয়া যায়। দেখেছেন যেন কেউ উদ্যান রচনা করেছে। সাগুগাছগুলি যেখানে জন্মায় প্রকৃতি যেন নিজ হাতেই ওদের রোপণকার্য সমাধা করেন।

ভারী আশ্চর্য লাগছিল।

বললাম—এ অঞ্চলে সাগুদানার গাছ পর্যন্ত হয়?

মাখন সিং বলেন—জগতের সারা বনরাজ্যে যা গাছ পাবেন তা একাই আফ্রিকা দিতে পারে। জানেন এখানে রবারগাছেরও প্রাচুর্য দেখা যায়?

—কোনখানে?

—ভল্টা নদীর ধারের ঘন জঙ্গলে এবং এই অঞ্চলে। তবে এ অঞ্চলে সে গাছ থেকে রবারের factory আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মনে মনে ভাবি যে, ভগবান্ আফ্রিকাকে যেন তাঁর বিশ্বের ভাণ্ডারের সর্ব প্রাচুর্যের প্রধান কেন্দ্র করেই গড়ে তুলেছেন।

৮

আফ্রিকাকে ইকোয়েটর অর্থাৎ বিষুবরেখা প্রায় আধাআধিই ভাগ করে বুক চিরে চলে গিয়েছে। উত্তরাংশ দক্ষিণাংশের থেকে কিছু বড়···পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় চার

হাজার মাইল ধরে এই বিষুবরেখার স্পষ্ট দৌড় মানুষ সাদা চোখেই দেখতে পায়··· কাজেই তার ঢাল উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ এই দু'দিক ঘিরেই হওয়া উচিত ছিল··· কিন্তু তা না হয়ে পূর্ব-পশ্চিমাংশ হঠাৎ ঢালু হলো কি করে তা একটু জানানো দরকার···যার জন্য কঙ্গোর এই বেসিন চোদ্দ লক্ষ পঁচিশ হাজার স্কোয়ার মাইল ধরে গড়ে উঠেছে। কঙ্গোর রূপ তাই কখন নদী আবার কখনও বাদা···এবং জলাংশ ও বনাংশ এত বেশী যে বনসম্পদরা নির্বিবাদে বেড়ে উঠতে অবকাশ পেয়েছে।

প্রথমতঃ বলা যেতে পারে মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকার মাঝে ভরা ছিল রাশি রাশি আগ্নেয়গিরি যা কালের প্রবাহে অগ্নি উদ্গিরণ করে নিঃশেষিত হয়ে বড় বড় খাদের সৃষ্টি করেছে···আর সৃষ্টি করেছে অগণিত লেক।

নৌকা এগিয়ে চলতে চলতে···বাদার মধ্যে ঢুকে পড়লো। [পৃষ্ঠা ৪১৪

দ্বিতীয়তঃ 'গ্রেট রিফ্ট্ ওয়াল' নামে একটি পাহাড়ী দৌড় এই অংশকে পূর্ব থেকে পশ্চিমাংশকে ঢালু করে তুলেছে। এই গ্রেট রিফ্ট্ ওয়ালের কথা আমার 'বনে জঙ্গলে' বইতে উল্লেখ করে গেছি।

গ্রেট রিফ্ট্ পাহাড় মর্থ রোডেসিয়ার ন্যায়সা লেক থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে দৌড়তে শুরু করেছে—টাঙ্গানাইক, কেনিয়া, আবিসিনিয়া হয়ে 'লেক রুডলফ'···তারপর সেটা Mediterranean অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর ভেদ করে Red Sea বা লোহিত সাগরের তল পর্যন্ত পৌঁছেছে। উত্তর প্যালেস্টাইনেও এই গ্রেট রিফ্টের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তা Adriatic হয়ে Alpsএ গিয়ে মিশেছে।

এই পাহাড়গুলির উচ্চতা সময় সময় ৮।৯ হাজার ফুট পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় অথচ তাদের শিখরগুলোর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে বড় বড় ক্রেটার বা খাদে পরিণত করেছে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-ধূম উদ্গার করে। টাঙ্গানাইকার গরোঙ্গোরো পাহাড় তার দৃষ্টান্ত।

এর দৈর্ঘ্য পৃথিবীর পরিধির একের ছয় অংশ বলে ধার্য হয়েছে। এরই দরুন ঈস্ট আফ্রিকার কতকাংশে ও বেলজিয়ান কঙ্গোর ওপর পরের পর লেকের উৎপত্তি হয়েছে।

এদের মধ্যে ভিক্টোরিয়া সবচেয়ে বড় হ্রদ যা থেকে ব্লু নাইল নদীর জন্ম... এই নদী এসে পড়েছে লেক অ্যালবার্টে...এবং ব্লু নাইল হোয়াইট নাইল হয়ে উত্তরাংশ ধরে বেরিয়ে গেছে...এবং লেক অ্যালবার্টের নিম্নাংশ থেকে বেরিয়েছে সেমলিকি নদী আর আসল কঙ্গো নদীর অববাহিকা স্রোত। সেমলিকি এসে লেক এডওয়ার্ডে পড়েছে, তারপর কাজিঙ্গ চ্যানেল ধরে জলস্রোত এসে পড়েছে লেক জর্জে...তারই অনতিদূরে পাঁচ হাজার ফুটের ওপর লেক কিভু...তারপর লেক টাঙ্গানাইকা এবং লেক ন্যায়সা। এই টাঙ্গানাইকা লেক ও ন্যায়সা লেকের মালভূমিতে লেক 'ব্যাংগুইওলো'র 'চাম্বেজী' থেকেই কঙ্গো নদীর ধারা শুরু হয়েছে...নদী ছুটেছে...আবার যেখানে যেখানে নীচু জমি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই বাদার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের নৌকা এগিয়ে চলতে চলতে এমনি এক বড় বাদার মধ্যে ঢুকে পড়লো। চারপাশ ঘিরে যত পাহাড় তত জঙ্গল...দিনের আলোয় এর যত সৌন্দর্য রাতের অন্ধকারে এর তত ভয়ংকর মূর্তি।

দিনের আলোতেই নৌকার গতিপথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা...মাখন সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, ডান দিক ঘেঁষে চলো বাঁ দিকে নয়...

বাঁ দিকের সোয়াম্প ছুটে চলেছে মাইলের পর মাইল। জানি না এর ভেতরে একবার পথ হারালে পথিক কি করে বার হয়ে আসবে।

টাঙ্গানাইকার গরোঙ্গোরো পাহাড়ের নীচে দুশো পঞ্চাশ মাইল বিস্তারিত সারেংগাটি প্লেনের মতোই এই বাদার বিস্তার। এর মাঝে নৌকায় বসে মনে হবে একটি সবুজ বেডচক্রের থালার মাঝখানে যেন ভেসে চলেছি।

মাখন সিং আঙুল দিয়ে বাঁ দিকের ঘন জঙ্গল দেখিয়ে বলেন—এখানে দু'রকমের আদিবাসী জংলীদের বাস—Bushmen আর Pygmies ('বুশমেন' আর 'পিগমীজ')।

বিষুবরেখার উত্তরাংশের অধিবাসীদের আদিম পুরুষদের 'ককেশিয়ান-উৎপত্তি' বলা হয়, বিষুবরেখার দক্ষিণাংশের অধিবাসীদের আদিম পুরুষদের বলা হয় বন্য হিংস্র রাক্ষস।

ককেশিয়ানদের মধ্যে যেমন রয়েছে সেমিটিজ, হ্যামেটিজ, ইয়োরোপীয়ান তেমনি এইসব নররাক্ষসের মধ্যে রয়েছে Hottentots, Bushmen ও Pygmies. আফ্রিকার উত্তরাংশ জুড়ে হ্যামেটিক পুরুষ—যেমন Berbes, ফেল্লাহিন কিংবা মিশরী, টৌরেগ, কাফ্রীদের পাওয়া যায় তেমনি আফ্রিকার পশ্চিমাংশে রাক্ষুসে আদিমদেরই জাত ভরে

আছে...এদের শিক্ষাদীক্ষা সমাজ সংস্কার সবই উত্তরাংশের লোকেদের সঙ্গে আলাদা। এরা সভ্য জগতের সঙ্গে এক সমাজে বাস করতে বোধকরি আরও একশ বছর নেবে।

আমি বলি—কেন, আফ্রিকার সমস্ত জনগণ তো শিক্ষাদীক্ষায় জগৎসমাজে আসন পাতছে।

মাখন সিং বলেন—তারা কি এই রাক্ষসসমাজভুক্ত...তাদের গায়ে দেখবেন হয়তো হ্যামেটিক রক্ত বইছে। আমি জোরগলায় বলতে পারি কঙ্গো বেসিনের বুশমেন আর পিগমীরা কোনোদিনই সভ্য জগতের ছায়া মাড়াতে পারবে না।

আমি বলি—না না, দেখবেন এরাও শীগগির আলোক দেখবে।

মাখন সিং বলেন—কি যে বলেন!...যারা আজও নরমাংসকে সবার চেয়ে সুস্বাদু বলে শিকার খুঁজে বেড়ায় তারা আপনাদের সভ্য সমাজের মেম্বার হবে?...আর যদি জোর করে মেম্বার করে নেন তাহলে দেখবেন এরা ধরে ধরে সভ্য সমাজের লোকগুলিকে আগুনে ঝলসে লুকিয়ে লুকিয়ে সব পেটে পুরে লোপাট করছে—

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি।

* * *

হাসি থামলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—চাম্বেজী থেকে কঙ্গো নদী নেমে এসে উত্তর দিকে না ছুটে কেমন করে হঠাৎ দক্ষিণে খানিকটা নেমে গিয়ে আবার উত্তরে পথ নিল এইটাই বুঝে উঠতে পারলাম না...

মাখন সিং বলেন—চাম্বেজী থেকে ব্যাংগুইওলো বাদা হ্রদে এসে ঢুকলো—তারপর হঠাৎ ইংরেজী এস্ অক্ষরের মতো জলস্রোত পাক খেয়ে নদী রোডেসিয়া থেকে বেলজিয়াম কঙ্গোতে ঢুকলো। এই 'S' জলস্রোতের নাম 'লওপুলা' নদী (Luapula)...এটাই রোডেসিয়া আর বেলজিয়াম কঙ্গোর সীমারেখা।...তারপর, নদী এসে ঢুকে গেল দক্ষিণে লেক 'মিউরু'তে (Lake Mweru)...এইখানে বেলজিয়ান কঙ্গোর বিখ্যাত 'কাতাঙ্গা' ডিস্ট্রিক্ট...এখানে আজ দু'হাজারের ওপর শ্বেতাঙ্গদের বাস।

এইখানে Lumbambashi শহরের আর্ট আর্টন্ট তামার ফ্যাক্টরী কাজ করে যাচ্ছে ...এই কাতাঙ্গার ধারে দুশো মাইল ধরে তামার বেল্ট চলেছে—কাতাঙ্গায় অবশ্য রেলওয়ে স্টেশন আছে...এখানকার জংশন স্টেশন হচ্ছে 'বুকামা' (Bukama)।

লেক মিউরু ৩০০০ ফুটের ওপর অবস্থিত...এরই জল লওপুলা নদীকে পুষ্ট করছে...এই নদীর শেষের দিকের নাম হচ্ছে 'লুভুয়া' (Luvua)...এটি লেক মিউরুর উত্তর-পশ্চিমে সৃষ্টি করেছে 'কুইকুরু গর্জ' (Kwikuru Gorge). ঐখানকার উত্তর

পাহাড় কুণ্ডেলুঙ্গু আর পিওটুর মধ্যে দিয়ে স্রোত বেরিয়ে আসছে…এর পর লুভুয়া নদী এসে এমন্তির এক অপ্রশস্ত বাদার মধ্যে ঢুকছে…তার ধারে অসংখ্য শিকারের জন্তুর দেখা পাওয়া যায়।

মাখন সিং বেশ গর্বভরে বলেন—ও অঞ্চলে আমিও শিকার করে বেড়িয়েছি আমার ছেলেবেলায়, অর্থাৎ তখন আমি সবে যুবক হয়ে উঠেছি।

বুকামার বাদা প্রায় একশ মাইল ধরে প্রশস্ত…এর পরই আবার সার সার লেক পাওয়া যায়—লেক ক্যাবাম্বা, লুসাম্বা, কিসালি, উপেম্বা তারপর কাবেলে।

আমি বলি—সর্দারজীর তো খুব স্মৃতিশক্তি—নিশ্চয়ই আপনি জিওগ্রাফিতে ফার্স্ট হতেন।

সর্দারজী স্মিত হেসে বলেন—লেখাপড়ায় এত মেধা থাকলে কি আর আপনাদের সঙ্গে বন্দুক হাতে ঘুরে মরি। এসব জায়গার প্রায় সবটাই আমার ঘোরা আছে বলে নামগুলো সড়গড় হয়ে গেছে…এ অঞ্চলে 'জিওমিন' টিন কোম্পানিতে কিছুদিন কাজ করেছিলাম…তাই।

আমি বলি—তারপর ?

—কি, চাকরির না নদীর ?

আমি বলি—দুইএরই…

—বুকামা থেকে রেলে করে এর মাইনিং সেকশন ঘুরতে হতো প্রায়ই…এখানে ওপুলা নদী নাম বদলে হয়েছে লোমামী (Lomami) কিংবা লাওলাবা কঙ্গো। এই ট্রেনের লাইনের ধারে পড়ে এই লাওলাবা জলপ্রপাত…এ প্রপাত এক উঁচু পাহাড়-শ্রেণীর সারা অঙ্গ বেয়ে শত ধারায় নীচে নেমে আসছে…একে বলে 'কালুলে' প্রপাত (Kalule Falls)…নীচে পড়েই নদীর নাম হয়ে গেল কালুলে। এমনি করে এইখান থেকেই কঙ্গো নদী দেশভেদে নাম বদলাতে বদলাতে উত্তরবাহিনী হয়ে ছুটেছে…সেমলিকি নদীকেও কঙ্গো নদী বলা চলে।

ক্যামেরাম্যান সুধীর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—তোমরা শুধু গল্পই করবে ? এদিকে কি ব্যাপার চেয়ে দেখো…।

(ক্রমশঃ)

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওর দিকে ফিরতে ও আঙুল দিয়ে দূরে বাদার অফুরন্ত জলের দিকে দেখিয়ে দিলে! চেয়ে দেখলাম—পুরো রিয়াঞ্জারো রেঞ্জের রূপালি মুকুটপরা মাথাটাকে নিয়ে, জলের মধ্যে ছায়া এসে পড়েছে। প্রকৃতির মুকুরে চাঁদের পাহাড় যেন তার নিজের প্রতিকৃতির ছায়া ফেলে নীরব বিস্ময়ে চেয়ে আছে।

দেখলাম সুধীর ক্যামেরায় তা তুলছে···

বললাম—জলে হ্যালেশন পাচ্ছ না··· ?

সূর্য ঘুরে গ্যাছে···তাই তো সারা ছায়াটা একসঙ্গে এসে নদীর বুকে জেগে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সারা বাদাটিকে বাঁ হাতে ফেলে নদীর প্রধান স্রোত ডান দিকে ঘুরে চলেছে ···অদূরেই নদীর বুকে একটি ছোট্ট দ্বীপ।···তার উপর দিয়ে আকাশে ধোঁয়া উঠছে···

মাখন সিং বললেন—ঐটা হচ্ছে রিয়াঞ্জারোর জাগ্রত আগ্নেয়গিরির ক্ষীণ চিহ্ন।··· ঐ যে দূরের peakটা দেখছেন··ঐটা মারঘারিট··· আর ওপাশের লাগোয়া পাহাড়টা হচ্ছে মাউণ্ট কিরুঙ্গা (Mount Kirunga)·· দেশী লোকেরা আবার ওকে বলে মুফোমবিরো (Mufumbiro)···অর্থাৎ যে পাহাড়চূড়া থেকে ধোঁয়া বেরোয়।···আজ পর্যন্ত এখানকার পিগমীর দল আর বুশমেনরা ঐ পাহাড়তলীতে গিয়ে অগ্নি দেবতার পূজা দিয়ে আসে।

আসলে ওটা ঠিক লেক কিভুই আর লেক এডোয়ার্ডের মাঝামাঝি··· তবে রিয়াঞ্জারোর সঙ্গেও সংযোগ রয়েছে।

আমি বলি—তাহলে ওটা আজও জাগ্রত বলুন···

—নিশ্চয়ই···মাখন সিং উত্তর দেন। বলেন—extinct হতে চলেছে তাই ভয়াবহ কিছু নয়।

বলি—এই দ্বীপটির নামটা কি ?

উনি বলেন—এটা দ্বীপ নয়—ল্যাণ্ডের খানিকটা দ্বীপের মত বেরিয়ে এসেছে···এরই ওপাশ বরাবর গেলেই তো পাবো রণমলজীর Diamond Procuring-এর Centre.

—এই জঙ্গলে ?

—হ্যাঁ, এই জঙ্গলে। আর procurerরা কে তা জানেন ?

—না !

—ওই পিগমীর দল···সারা বছরে হয়ত ৪.৫ খানা যোগাড় হয়, তাতেই লাল হয়ে যান।

—অথচ যারা যোগাড় করে দিচ্ছে—তারা এর দাম বোঝে না···।

—না তা বোঝে না···বুঝলে কি আর জংলী থাকতো···না সুবিধে পেলেই মানুষ ধরে খেতো ?

৯

নদীর বাঁক যতই ঘুরতে থাকে মাউণ্ট অফ্ দি মুন ততই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে···

সত্যিই রিয়াঞ্জারো পাহাড়শ্রেণীকে এখান থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যানলে সাহেব প্রথম এর নামকরণ করেন চাঁদের পাহাড়।

স্ট্যানলে সাহেবের চোখে বোধকরি রাতের রিয়াঞ্জারোর রূপ এসে লেগেছিল···

পঞ্চাশ মাইল ধরে এই অপরূপ তুষারধবল কিরীটি মাথায় পাহাড়ের দৌড় এক হিমালয় ছাড়া আর কোথাও আছে বলে জানি না···এর অলিতেগলিতে প্রপাত ঝরে পড়ছে···এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্যামা শোভামণ্ডিত প্রকৃতির নিকুঞ্জে রাখা হ্রদের পর হ্রদ।

সেই শত শত হ্রদ-মণ্ডলীর রানী হয়ে বসে আছে লেক ভিক্টোরিয়া।

মিঠেল জলের এত বড় হ্রদ ভূ-ভারতে নেই···এর প্রশস্ততা আয়র্ল্যাণ্ডের চেয়ে কিছুটা বড়···এরই ধারে ধারে সতেরটি বন্দর রয়েছে, যার ওপর দিয়ে বারশ টনের জাহাজও অনায়াসে ভাসমান হয়ে যাত্রী বইছে।

লেক ভিক্টোরিয়া···জগদ্বিখ্যাত নীল-নদীর জন্মদাতৃ যদিও ভিক্টোরিয়া ইউগাণ্ডা প্রদেশের অধীন, তবু বলা যেতে পারে—চাঁদের পাহাড়ের এক পিঠে এরা—অপর পিঠে লেক ট্যাঙ্গানিকাকে নিয়ে আর একদল হ্রদ বাসা বেঁধেছে যার জন্মসূত্র রিয়াঞ্জারোর পর্বতমালারই দান মাত্র।

সবুজ শ্যামঘন বনানীর মধ্য দিয়ে উপলখণ্ড বেয়ে নেমে আসছে একটি প্রখর স্রোতের ধারা···তার পেছনে চিত্রপটে চিত্রের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্বেত-তুষারমণ্ডিত রিয়াঞ্জারো···

বুঝলাম, যে দ্বীপের কথা বলেছি···এ তারই এক অংশবিশেষ। শ্যামশোভায় এ যে এত সুন্দর হোতে পারে কল্পনাও করিনি।

বেলা চারটে বেজেছে···

মাথার সূর্য পাশে ঢলে এর প্রখর তেজ এসে পড়েছে এই উপলখণ্ডবিধ্বস্ত নদীর স্রোতে। তাই ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলছে তার প্রতিটি ছোট ছোট ঢেউ কণিকা। মনে হচ্ছে যেন শত হীরক একসঙ্গে জ্বলে জ্বলে উঠে তার জ্যোতিজাল বিকির্ণীত করছে।

নৌকার চালনে ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে এই অফুরন্ত রূপ ছবি—

হঠাৎ যেন দামামার আওয়াজ কানে এসে পৌছল···

কোথা থেকে এ শব্দের হঠাৎ অভ্যুদয়···

চারপাশে ঘন বনে আচ্ছাদিত···তার মাঝে এ শব্দে যেন গা ছমছম করে ওঠে···বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে চলে···

নির্বাক উৎকণ্ঠায় চেয়ে থাকি !

নদী বেঁকেই চলেছে দ্বীপের বাঁক ধরে···

হঠাৎ চোখে পড়লো—বিশাল বিস্তারিত জলা তারই ওপর কাঠের খোলা সার সার পোঁতা, তারই ওপর সার সার দেশী আদিবাসীদের পাতা-ঢাকা ঝোপ্‌ড়ি···

এ আওয়াজ সেখান থেকেই আসছে মনে হোলো···

মাখন সিং বললেন—এই হচ্ছে পিগমী এরিয়ার শুরু।

ঐ যে দূরের জলস্তরের অধিবাসী · ওরা কিন্তু পিগমী দলভুক্ত নয়।

ওরা হচ্ছে বুশম্যান্···

ওরাই এককালে হিংস্র ছিল, ওদের স্যাঙ্গাত ছিল এই বন্য পিগমীর দল। আজ ওরা কিছুটা পিগমীর থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ ওরা বনের জন্তু আর স্রোতের মাছ ধরে খেতে শিখেছে, আর শিখেছে বিদেশী ভ্রমণকারীদের জঙ্গলের পথে লিডার হতে।

ওরাই আজ পিগমী এরিয়ার পথপ্রদর্শক···

ওরা বোঝে পিগমীদের ভাষা। তাই বৈদেশিক অভিযাত্রীদের মাঝে ওরা যেন ভাষাবিদ্ হয়ে পরস্পরের সৌখ্য-সূত্র বাঁধবার চেষ্টা করে।

এদেরই সাহায্যে এই বন্য-জগতে রণমলজী তার হীরা সংগ্রহ অভিযান সফল করে থাকেন···আরও সংগ্রহ করেন বনজ বহু মহামূল্য সামগ্রী যাহা সভ্য জগতের বিস্ময়···এমন কি এদের সাহায্যে সংগ্রহ করেন বনের ওষধি পর্যন্ত।

এদের দামামার শব্দ শুনে মাখন সিংজী বললেন—যাক রণমলজীর কোঠিতে খবর পৌঁছে গেল।

বিদেশী কেউ এ অঞ্চলে এলেই, এরা অমনি দামামা ঘোষণায় এ অঞ্চলের সব অধিবাসীদের জাগ্রত করে দেয়।

বিদেশের অনুপ্রবেশ-বার্তা বনাঞ্চলের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

—যারা বরণ করে এঁদের ঘরে তুলতে যান, তারা এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে এদের সঙ্গে করেন ব্যবসায়ী বেচাকেনা, আর যারা এঁদের দুশমন ভেবে সরে যেতে চান তারা দূরে বনান্তরে গা ঢাকা দেয়।

আমি বলি—আমাদের আগমনবার্তায় এরা খুশী না অখুশী আপনি বুঝতে পারলেন সর্দারজি?

সর্দারজী বলেন—আমাদের তো খবর দিয়ে আসার ব্যবস্থা করেই এসেছি, কাজেই এ দামামা আতিথ্যের বাজনা বলা যেতে পারে···

কিন্তু···

এ দামামা ঘন-অরণ্যের জংলী পিগমীদেরও জানিয়ে দেওয়া হোলো যে সাবধান··· বিদেশী দ্বারে···বন্দুকধারীর দল আগত!

বলে—হো হো করে হাসতে লাগলেন।

নদীর পাশ বেয়ে নৌকা এদের জলোবস্তি ছাড়িয়ে এগিয়ে চললো—একটি ছোট শাখা নদীর মোহানায়···

এরই দুপাশ ঘিরে জংলীদের বসতি।

ওপাশের পাড় উঁচু হতে হতে পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে গা ঢেকেছে, এপারের বস্তির মুখে বুশম্যানদের উৎকট অপেক্ষা।

পাহাড়তলীর উঁচু খোলা জায়গাতে ছোট ছোট ঝুপড়ির সারি দেখা যাচ্ছে···এপাড়ে বস্তির প্রতিটি ঝুপড়ির মাথাটা যেন সরু হতে সরু হয়ে একটা ছুঁচোলো মটকায় শেষ হয়েছে।

ঝুপড়িগুলির সারা চালটা জমি থেকেই উঠতে শুরু হয়েছে এবং এই চালার গা কেটেই ভিতরে ঢোকার পথ···

আমরা নৌকায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান বুশম্যানদের বীভৎস বিটলে রূপ আর আকৃতি দেখে ভয়বিহ্বল চোখে চেয়ে আছি···ভাবছি এই বিটলেরা যদি বুশম্যান হয় তবে পিগমীরা আরও কত ছোট হবে?

আবার ভাবছি, এরা আমাদের আপ্যায়ন জানাবার জন্যে সব দল বেঁধে অপেক্ষায়

দাঁড়িয়ে, না নামামাত্রই চটাপট আমাদের বেঁধে ফেলে রাত্রের ভোজের আয়োজন করে অগ্নিদেবতার পূজা সমাপন করবে?

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

সবার মুখের চোখের অবস্থাই সমান···কেবল, মাখন সিং যেন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ওদের পানে স্মিত হেসে চেয়ে আছেন।

* * *

নৌকা তীরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাখন সিং এক বিকট চীৎকারে ওদের অভিবাদন জানালেন।

ওরাও সমস্বরে তার উত্তর দিল···তারা হাঁটুতে হাত দিয়ে অর্ধনিম্ন অবস্থায় মাথাটা সামনের দিকে হেলিয়ে অভিবাদন জানালো···।

ত্রস্তবুকে আমরা একে একে নেমে দাঁড়ালাম তীরে।

সে এগিয়ে এসে মাখন সিং-এর সঙ্গে করমর্দন করলো।

ওদের মধ্যে যে সবার চেয়ে লম্বা অর্থাৎ ৪ ফুট, সে এগিয়ে এসে মাখন সিং-এর সঙ্গে করমর্দন করলো।

আমরা বিস্ময়চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকি।

ওদের দলের অপর লোকগুলো যেন মিলিটারী সোল্জার···অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দারের আদেশের অপেক্ষায়।

বনের মাঝে জংলীদেরও ডিসিপ্লিন বলে বস্তুটা সবার চোখের সামনে যেন প্রকট হয়ে উঠলো।

বুশম্যানদের সর্দার কি যেন ওদের ভাষায় সর্দারজীকে বললো, তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে কি সব মিলিটারী-গলায় আদেশ জারী করলো!

দেখতে দেখতে সবাই ছুটে এসে বোটের মধ্য থেকে আমাদের জিনিসপত্তর টপাটপ

মাথায় তুলে লাইন ধরে চলতে শুরু করে দিল। সুধীর হা হা করে উঠলো—ক্যামেরার জিনিসপত্তরে যেন ওরা হাত না দেয়।

ওদের সর্দার এগিয়ে এসে সুধীরকে বললো—বানাকুবা…মি-মা—সিকিমি…

মাখন সিং বললেন—কি বলছে বুঝলেন? ওরা এসব জিনিস চেনে।

আমি বলি—ক্যামেরা চেনে? কি করে?

মাখন সিং বললেন—মেট্রোগোলডুইন থেকে শুরু করে ফক্স বলুন, ইউনাইটেড আর্টিস্ট বলুন…প্যারামাউণ্ট বলুন…আমেরিকার সব সিনেমা কোম্পানিই এ অঞ্চলের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছে।

আমি বলি—তা অবশ্য নিয়েছে…টারজান দি এপ্‌ম্যান ছবিতে মেট্রোগোলডুইন মায়ার পিগমী বস্তি দেখিয়েছিলেন, হাতিদের সঙ্গে পিগমীদের লড়াই, হাতিরা শুঁড়ে করে পিগমীদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে আছাড় মারছে…তাদের পায়ে চেপে ধরে তাদের কলজে ফাটিয়ে দিচ্ছে…এ সব ছবি তার মধ্যে ছিল। পিগমীরা দলে দলে তীরধনুক নিয়ে কিভাবে একসঙ্গে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করে বড় বড় হাতিকেও আসন্ন মৃত্যুর কবলে ফেলছিল…তাও দেখিয়েছিলেন।

মনে হোলো যে তাঁরাও তাহলে এই রিয়ানগ্গারোর নীচে পিগমীদের ডেরায় এসেই ছবি তুলে নিয়ে গেছেন। সে আজ কতদিনের কথা…প্রকৃতপক্ষে টারজান দি এপ্‌ম্যান ছবি ১৯২৬-২৭ সালে কলকাতায় দেখানো হয়, কাজেই অনায়াসেই বিশ্বাস করা চলে যে ছবিখানির কাজ ১৯২৩-২৪ সালেই শুরু হয়ে গেছে।…

ভাবলেও ভয় করে যে ১৯২৩-২৪ সালে এইসব অঞ্চল যে কী ভয়াবহ ছিল…কি বিপদসংকুল ছিল…অথচ…

দেখতে দেখতে আমাদের জিনিসগুলি পাচার হয়ে গেলো বনের অন্তরালে। একটি সরু পথ ধরে আমাদের দলকে বুশম্যান-সর্দার এগিয়ে নিয়ে চললো জঙ্গলের মধ্যে…

উঁচু উঁচু বনস্পতিতে জঙ্গল ভর্তি, তার পাশেই আবার কলাগাছ…অফুরন্ত কলা ফলে আছে…ফলের ভারে গাছগুলো যেন সব মাটিতে নুয়ে পড়ছে… সাদা লাল দু রঙেরই কলা দেখা যাচ্ছে…মনে হচ্ছে পথে যেতে যেতেই গাছ থেকে কলাগুলো ছিঁড়ে খাই।

জঙ্গলের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলা জায়গা…আশপাশে তার দুচারটা চেনা ফলের গাছ তার সামনে মোটা মোটা খোলা পোঁতা তার উপর জঙ্গলের সভ্যজগতের কটেজ…বুঝলাম রণমলজীর ডেরা।

জায়গাটির বিশেষত্ব হলো জঙ্গলের মধ্যেও জন্মে রয়েছে বড় বড় সাবুদানা গাছ তারই ছায়ায় ছায়ায় রণমলজীর বাংলো ডেরা।

বললাম—সর্দারজী এগুলো কি সাবুদানা গাছ?

উনি উত্তর দিলেন—এগুলোর নাম "রাফ্‌কিয়া পাম"…এ গাছে নারিকেলের মত ছড় নেমে একরকম খেজুরের মত ফলও হয়…তা খেতে খুব মিষ্টি।

রণমলজীর ঘরগুলির পাশেই দেখি বুশম্যানরা আমাদের টেণ্ট খাটিয়ে ফেলেছে।

বললাম—রণমলজী কোথায়?

মাখন সিং বললেন—জঙ্গলে গেছেন সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন বলে গেছেন। সেই কথাই তখন বুশম্যান সর্দারের সঙ্গে হচ্ছিল।

জায়গাটাকে দেখে অদ্ভুত ভাল লাগছিল।

এক ভয়-সংকুল বনের অভ্যন্তরে যেন এটি রণমলজীর ছোট্ট স্বর্গ…

বাংলোর চারপাশে যারা দু একজন ঘুরছিল তারাও বুশম্যান।

ওদের মধ্যে একটি নারীকেও দেখতে পেলাম।

বললাম—সদারজী, এই জাতের এই প্রথম মেয়েছেলে দেখলাম।

সর্দারজী বলেন—এদের মেয়েদের দেখা ভাগ্যের কথা…যদিচ এরা জঙ্গলের সরল নিঃসংকোচ বনচারী তবু খুবই লজ্জাশীলা—এরা হুম করে সকলের সামনে এগিয়ে আসে না…এদের পুরুষদের ওপর বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার আর এরা সন্তান পালন করবে, নিজেদের বনসম্পদ ফলপাকুড় সংগ্রহ করবে ইত্যাদি।

আমি বললাম—এরা কি রান্না করে খায়?

সর্দারজী বলেন—রামচন্দ্র। রান্না? যা কিছু খায় কাঁচা গাছ থেকে পেড়ে, নইলে আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

এদের বাঁদর পর্যায়েই ফেলা যেতো…কিন্তু এরা বাঁদরদের মত ফলমূল সবজিভক্ষী নয় মাংসও খায়, মাছও খায়। তবে বুদ্ধিতে এরা সাধারণ সভ্যমানুষের চেয়ে অনেক প্রখর, আর বন্য জন্তুর মত এরা গন্ধ শুঁকে বুঝে নেয়, কি এবং কেমন জীব তাদের আশেপাশে আসছে বা যাচ্ছে…

তাছাড়া এদের instinct-টা খুব Sharp…চলাফেরা তাকানো দেখলেই এরা বুঝে ফেলে যে অপরপক্ষ কি করতে চায়!

আর সবচেয়ে বড় গুণ যে এরা বন্য হলেও নিজেদের রোগ বা অসুখ নিজেরাই ধরে ফ্যালে এবং নিজেরাই জঙ্গল থেকে খুঁজে আনে বন্য ওষধি। এদের ওষুধ এক এক সময় এমন ফলপ্রদ হয় যে বহু দুরারোগ্য রোগ যা ডাক্তাররা ভাল করতে হিমশিম খেয়ে যান, তাও এরা অনায়াসে করায়ত্ত করে।

এদের বনের ওষধি শুধু ওরাই চেনে, অপরকে দেখালেও ঠিক চিনে আনতে পারবে

না! রণমলজী এদের কাছ থেকে কিছু কিছু ওষুধির গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে পেটেণ্ট ওষুধ বার করবার রিসার্চে আছেন।

টেণ্ট খাটানো হয়ে গেছে—আমাদের বয় জলগরম করে চায়ের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে।

মাখন সিং বলেন—আজ এখন থেকে পুরো rest…রাত্রে রণমলজীর কাছে আপনার ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিয়ে বলবেন তিনিই কিভাবে কি ছবি ওঠাতে হবে পরামর্শ দেবেন। তারপর…কাল সকাল থেকে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলেন? চায়ে চুমুক দিয়ে সবাই বল—তথাস্তু!

১০

ছ'টা বেজে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যার তখন নামগন্ধও নেই।

চা খাওয়ার পর বললাম—চলুন সর্দারজী সবাই মিলে কাছাকাছি অঞ্চলটা ঘুরে দেখে আসি।

সুধীর বললো—আপনারা যান…আমি ক্যামেরার ফিল্ম আনলোডিং করব তারপর একটু টেণ্ট বের করার চেষ্টা করব। রাত্রে অন্ধকারে ফের লোডিং করে নিতে হবে।

আমি বললাম—ওগুলো রাত্রে বসে করলেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে। তুমি ক্যামেরাম্যান সঙ্গে থাকলে যদি কিছু স্পেশাল সাবজেক্ট নজরে পড়ে তার ছবি তোলার প্রোগ্রাম করে নেওয়া যাবে…তুমিও চলো—!

মিত্তির বললে—না, বরং আমি ওকে একটু অ্যাসিস্ট করি। মাউণ্ট রিয়ানঞ্জারোর শেষ ছবিটার একটা টেণ্ট ততক্ষণ বার করে দেখে নিক, নইলে কাল ড্রামাশট্ শুরু হবে তার আগে আমাদের মেশিনারি চেক করাও দরকার…তাছাড়া ফোটোগ্রাফিক রেজাণ্ট কেমন আসছে দেখে নেওয়া উচিত না?

মিত্তির যা বলছে তা ষোল আনাই ঠিক…তবু ওরা গেলে ভালই হোতো…

মিত্তির সুধীরের অ্যাসিস্টেণ্ট নয় বরং আমি যে বই সুটিং করছি তাতে ভুলুয়া চাকরের পার্ট করছে…ব্যানার্জি করছে গুজরাটি কাথিয়াবাড়ীর শেঠজীর রোল। কিন্তু মিত্তিরের ক্যামেরায় ঝোঁক তাই ও থেকে যায় সুধীরকে সাহায্য করতে।…

আমি, মিঃ ব্যানার্জি, মিঃ সা এবং আলিভাই সর্দারজীর সঙ্গে আমাদের ক্যাম্প এলাকা থেকে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম।

আম বয়কে বললাম—লেটে মাজি…

অর্থাৎ বয়কে এক গেলাস জল আনতে অর্ডার করলাম।

সাথীরা দুপা এগিয়ে গিয়ে ক্যাম্পের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কইছে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি জলের অপেক্ষায়…

এমন সময় কে যেন স্ত্রী কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে উঠলো।

পেছন ফিরে দেখি সেই বুশম্যান-মেয়েটি একটি কাচের গেলাসে জল এনে সামনে দাঁড়িয়েছে।

আমি ফিরে চাইতেই স্মিত হেসে বললে—"মাজি-বানাকুবা"—

আমি চোখ মেলে দেখি এই বন্য সৌন্দর্যের দিকে। সাদা সাদ দাঁতগুলো কালো মুখে যেন দন্তরুচি কৌমুদীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, রং আবলুশ কাঠকেও হার মানায়… কালো তো বটেই তবে যাকে বলে মিশকালো। বুকটায় একটা বন্ধনী…উচ্চতায় মেয়েটি হবে বোধকরি আড়াই কি তিন ফুট… চোখে মুখে এক বন্য সারল্য তাতে আবার মৃদু হাসি লেগে রয়েছে—মোটামুটি খুব খারাপ লাগছে না, বয়স অনুমান করা খুবই শক্ত তবু মনে হয় তন্বী।

—"মাজি-বানাকুবা"—

বললাম—তোমার নাম কি? অর্থাৎ সোহালী ভাষায় লেটে মাজি পর্যন্তই বিদ্যে অর্জন করেছি এতদিনে। এর বেশী কথা জানা নেই তাই সোজাসুজি বাংলাভাষায় জিজ্ঞেস করলাম…

বুশম্যান সুন্দরী তার ভাষায় আমায় কি যে বললো বুঝলাম না…বুঝলাম সে হাসছে এবং সে হাসি আনন্দ-ঔৎসুক্যের।

এমন সময় আমাদের বয়টা আমায় এসে বললে— (ক্রমশঃ)

বিষুবরেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

…"বানাকুবা…লুল্লু…সিংজী…

তারপর মেয়েটার দিকে চেয়ে কি যেন বললে। আমি ভাবি যদি কোনো নামে ওকে… আগে বা পিছে…ডাকে।

বুঝলাম যে ওদের ভাষা এতই দুর্বোধ্য যে নাম বলছে কি অন্যকিছু বলছে তা অনুধাবন করা অসম্ভব।

এগিয়ে মাখন সিংকে বললাম—জল খাচ্ছিলাম…তা জল এনে দিল এখানকার এক বুশম্যান সুন্দরী…ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ও বুঝতে পারলে না…

সর্দারজী বলেন—কী ভাষায় নাম জিজ্ঞাসা করলেন…আপনি তো এখানকার ভাষা জানেন না…

আমি বলি—না জানি না। তাই স্রেফ বাংলা ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম।

সবাই আমার কথায় হেসে ওঠেন।

* * *

আমাদের ক্যাম্পসংলগ্ন বাগানের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের পিছনদিক পানেই প্রথম পদার্পণ করলাম…

বাগান বললাম, কারণ জঙ্গল হলেও…রাফিয়া পাম দিয়ে ক্যাম্পের চারপাশের বনকে অনেকটা বাগানের মত সাজিয়ে তুলেছে।

পেছনের দিকে এগিয়ে দেখলাম যে, যে নদী বেয়ে আমরা এখানে এসেছি…পিছন দিয়ে সেই নদীরস্রোতই প্রবাহিত।

আমরা কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম···আমাদের ২০ গজ দূরে জলের মধ্যে দেখলাম চারটি হিপোপটেমাস অর্থাৎ কিবাকো—তাদের সারা অঙ্গ জলে ডুবিয়ে মুখগুলিকে জলের ওপর তুলে আমাদের পানে জুল জুল করে চেয়ে দেখছে···যেন নবাগত অতিথি অভ্যাগতদের চিনে রাখার চেষ্টা। এ প্রচেষ্টা তাদের যতই মনোলোভা হোক হঠাৎ আটজোড়া ফোলা ফোলা চোখের এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের মনকে খুশীর আমেজে ডুবিয়ে দিতে পারল না।

এদের দেখে মনে হচ্ছে যে এরা শুধু নিরালায় একপ্রান্তে জলে ডুব মেরে দু'জনে দু'জনে সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সময় কাটাচ্ছিল হঠাৎ নবাগতদের আবির্ভাবে হতচকিত হয়ে পড়েছে···

রাত্রের জ্যোৎস্নায় এরাই আবার হয়ত দুটি সাথী দুটি সাথিনীর সঙ্গে অট্টহাসি হাসবে।

মাখন সিং বললেন—এই স্রোতেরই ওপরে আর একটা স্রোত এসে যোগ দিয়েছে যার মধ্যে আপনি কুমীর পাবেন অগুন্তি···

বলি—কি মানুষখেকো কুমীর না মেছো কুমীর?

মাখন সিং বলেন—মেছো কুমীর কি?

আমি বলি—মেছো কুমীর দেখেননি···মুখগুলো সরু সরু বাকীটা অবশ্য মানুষখেকো কুমীরের মতই। তবে তারা মানুষখেকো নয়, শুধু জলের জীবজন্তুকে উদরস্থ করে। এগুলো কটকের মহানদীতে খুব।

মাখন সিং উত্তর দেন—না, সে রকম কুমীর আফ্রিকায় আপনি পাবেন না, এখানে কুমীর মানেই "ঘরিয়াল" অর্থাৎ মানুষখেকো। তবে আপনি যা বললেন, তা কিন্তু আমি কখনও দেখিনি।

আমি বলি—আমি দেখেছিলাম আমার 'মহুয়া' বই স্যুটিংএর সময় কটক সম্বলপুর জঙ্গলে। এখানে মহানদী চোদ্দ মাইল ধরে পাহাড় ফেড়ে নেমে আসছে···তাই ওখানকার দেশী লোকেরা বলে সাতকোশিয়া গর্জ! অর্থাৎ সাতকোশ বিস্তারিত গর্জ···

সাতকোশিয়া গর্জ জগতে বিখ্যাত বিখ্যাত গর্জের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শুনেছি রাশিয়াতে ওর চেয়ে ও একটা লম্বা গর্জ আছে।

টিকারপাড়া ঘাটে স্যুটিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর!

সত্যি, অত কুমীর একসঙ্গে মাছের মত ঘুরে বেড়াতে আর কখনও দেখিনি। বোটে চড়ে মহানদীর স্রোতে গর্জ বেয়ে নেমে আসছিলাম—যেন এই কুমীর সংকুল ভিড়কে ঠেলে ঠেলে। তবে ওখানে সব কুমীরই দেখেছিলাম মেছো কুমীর অর্থাৎ মুখ সরু।

মাখন সিং বললেন—আর ডাঙ্গায় বাঘ কি রকম?

আমি বলি—ডাঙ্গায় বাঘ মানে··· টিকারপাড়া ঘাট হচ্ছে আঙুল জঙ্গলে অবস্থিত···টিকারপাড়া ঘাটে পৌঁছুতে গেলে পাহাড়ী পাস-এর ভেতর দিয়ে আসতে হয়। আমরা যখন মোটরে চড়ে এগুচ্ছি···হঠাৎ বনের জংলী সাঁওতালরা চিৎকার করে উঠলো···'গেল গেল নিয়ে গেলো' বলে।

মোটর থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

লোকগুলো বললে—এখনি একটি লোক সাইকেল চড়ে এই পথে চলেছিল ···হঠাৎ একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার পথের ও পাহাড় থেকে সাইকেলের ওপর লাফ মেরে সাইকেলের লোকটিকে ঘাড়ে ফেলে এ পাহাড়ের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোটর থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

পথে দেখলাম তাজা রক্তের চিহ্ন। সাইকেলখানার গা বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে আর সাইকেলখানা যেন জট পাকিয়ে তালগোল হয়ে গেছে। কি সর্বনাশ!

তারপর টিকারপাড়া ঘাটে যখন পৌঁছুলাম···দেখলাম আমাদের থাকবার বাসাটা একটা Treasury ঘরের মত চারিদিকে লোহার রেলিংয়ে ঘেরা।

এই রেলিং ঘেরা ঘরটি পাওয়া গিয়েছিল ফরেস্ট অফিস থেকে। রেঞ্জাররা এলে তাঁরা এইখানেই রাত্রিবাস করেন। এই ঘরেই আমরা আশ্রয় নিলাম।

বলব কি মশাই, সারারাত রেলিংগুলোর বাইরে বাঘের সে কি গজন···ঘরের জানলা দিয়ে দেখি রেলিংএর বাইরে সত্যি এসে দাঁড়িয়েছে শ্রীমান ব্যাঘ্র মহাশয়···রীতিমত রেলিং-এ মুখ রেখে শুঁকে বেড়াচ্ছে।

মাখন সিং বলেন—অনেক রকম শিকার করেছি, কিন্তু আমার বরাতে বেঙ্গল রয়েল টাইগার মারার অবকাশ আর এল না—অথচ জীবনভোর আমার এটা একটা স্বপ্ন!

আমি বলি—ভারতের কোনো জঙ্গলে আপনি কখনও যাননি বুঝি?
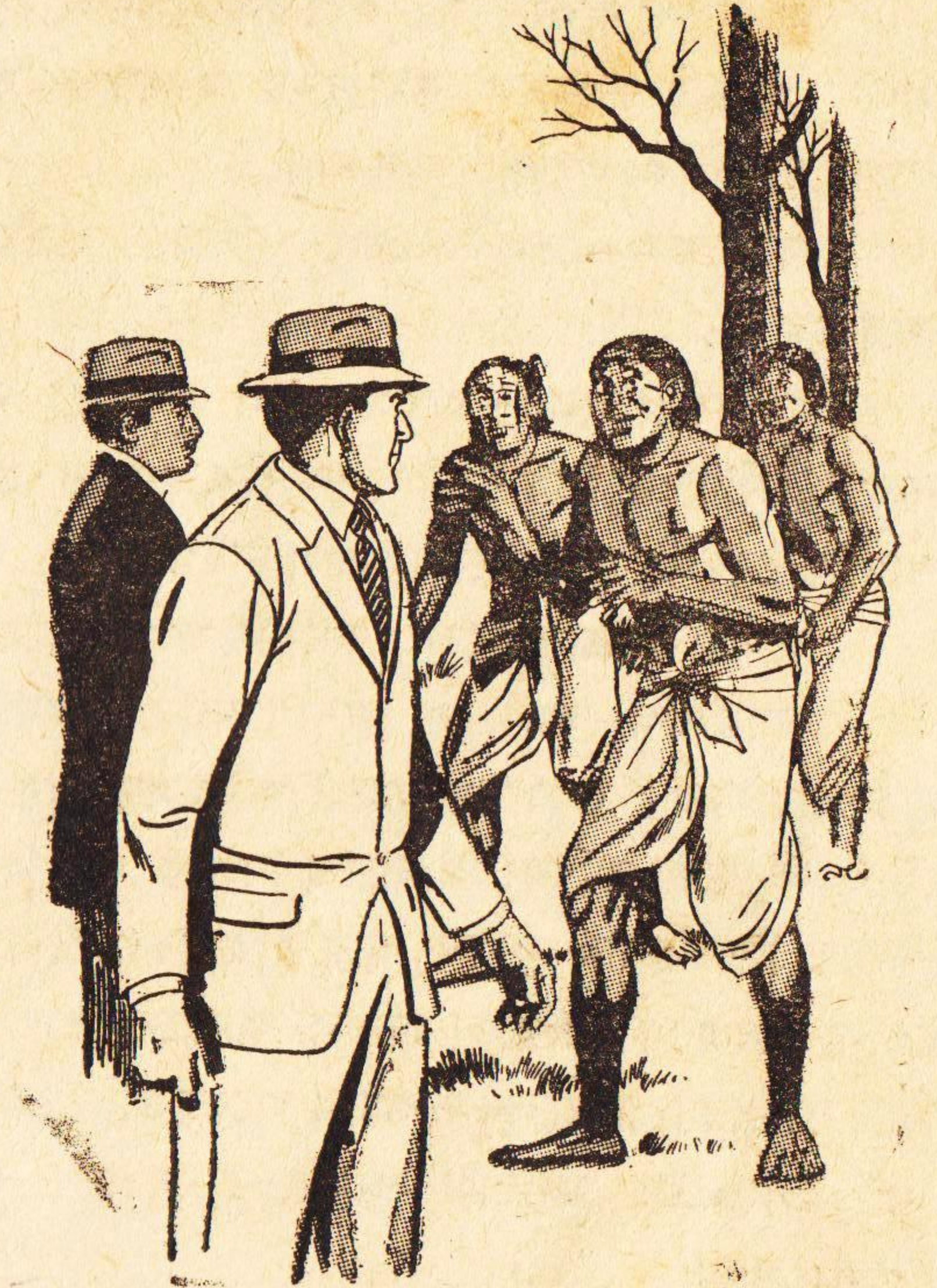
মাখন সিং বলেন—না, ভারতীয় হয়েও ভারতের জঙ্গল দর্শন আমার জীবনে হোল না। অথচ শুনেছি···ওখানে কুমায়ুনের নরখাদক বাঘ, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল, হাজারিবাগের বাঘ···কিছুই দেখা হোল না।

আমি বলি—তেমনি এখানে সিংহ, হাতী, গণ্ডার, কিবাকো···সবই তো নিঃশেষ করেছেন?

মাখন সিং বলেন—রয়েল বেঙ্গল শিকারী না হোলে আর কিবা শিকারী হলাম। সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ নামী শিকারীর পর্যায়ে উঠতে পারে এক গরিলা শিকার করতে পারলে, নেক্সট্ হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

আমায় জিজ্ঞেস করেন··আপনি জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি তুলেছেন কখনও?

আমি বলি—হ্যাঁ··সে সুযোগ আমি একবারই জীবনে পেয়েছিলাম "মহুয়া" ছবির সুটিং-এর সময়। তবে "আঙুলের" কটক সম্বলপুর জঙ্গলে নয়, উড়িষ্যায় 'তালচর' স্টেটে।

মহারাজা কণিকা আমাদের সহৃদয় বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে ব্রাহ্মণী আর বৈতরণী নদীতে গিয়েছিলাম কুমীর আর হরিণের ফোটো নিতে। মহারাজা কণিকার স্টেটে ছবি তোলা শেষ হলে মহারাজা কণিকা আমাদের তালচরের রাজার কাছে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তালচরে বাঘের ছবি তোলার জন্যে।

তালচরের মহারাজ আমাদের যথাযথ আপ্যায়িত করে এর সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

বন্দোবস্তটা হচ্ছে···উঁচু একটি মাচান করে আমাদের ক্যামেরা ও ক্যামেরাম্যান ইত্যাদিদের দাঁড় করিয়ে বিডার দিয়ে জঙ্গলে হানা বসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে বনের বহু জন্তুরই দেখা সামনের খোলা মাঠে একবার করে পেয়েছিলাম।

জঙ্গলের ধারে একটুখানি খোলা চৌকস জমি···যার উপর সূর্যকিরণ প্রায় সারাদিনই থাকে···ছবি তোলার মত উপযুক্ত স্থান। এই জমিটুকুর এক ধারেই মাচান বাঁধা···তার উপর আমরা কজন···কিন্তু বিডারের তাড়া খেয়ে যখন জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারগুলো এসে নিমেষে ছুটে চলে যাচ্ছিল, আমরা হতচকিত হয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

শেষে পর্যন্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগারও হুংকার দিয়ে এসে সামনের খোলা মাঠে দাঁড়ালো এবং এক নিমেষেই অপর লাফে জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিল···

ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছিল···

ছবি উঠলো।

সারাদিনের কসরতের পর ঘরে ফিরলাম। ক্যামেরাম্যান আমায় নিরালায় ডেকে বললেন—আজকের কোনো ছবিই ওঠেনি···খালি ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছি···

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করি—সেকি হ্যাণ্ডেল যদি ঘুরিয়ে থাকেন তবে ছবি উঠবে না কেন?

উনি চুপি চুপি আমায় বলেন—ভয়ে ক্যামেরার লেন্স পরানো হয়নি।

মাখন সিং থেকে আমার সঙ্গের সব সাথীই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে মাখন সিং বললেন—ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ছবি তোলা হচ্ছিল মানে সে এক প্রিমিটিভ যুগে বলুন?

আমি বলি—তা একরকম··কারণ 'মহুয়া' তোলা হয়েছিল ১৯৩০।৩১ সালে···তখন ব্যাটারিতে ক্যামেরা চলতো না···চলতো হাতে ঘুরিয়ে···

মাখন সিং প্রশ্ন করলেন—এবারের ক্যামেরায় লেন্স পরানো হচ্ছে তো···

আবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

সত্যি কথা বলতে কি···আমাদের ভারতে ক্যামেরা বা ছবি তোলার ইকুইপমেণ্ট এত পুয়র যে বিদেশীদের কাছে তার তুলনা হয় না! হিকায় সুটিং করছিলেন মেট্রো গোণ্ডুইন মায়ার···আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন··নিজে চোখে দেখে এলাম··কি হিউজ অ্যারেঞ্জমেণ্ট তাদের। মুভিং লাইট উইথ ডায়নামো···মুভিং লেবরেটরি···প্রোডাকশন ইউনিটের সাজ সরঞ্জাম দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়···সে তুলনায় আমরা যে ছবি তুলছি তা এতই মিগার যে কথায় বলা যায় না···তবু ভারতীয়রা ছবি উঠিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছে এই এক বিস্ময়ের বিস্ময়।

আমরা একপ্রকার ছাগল দিয়ে জব মাড়ানোর কাজ করে চলেছি···বাহাদুরি আছে ভারতীয়দের।

মাখন সিং বলেন—ভারতীদের বুদ্ধির মত যদি কর্মশক্তি এবং কর্ম-সরঞ্জাম থাকতো তাহলে এঁরা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাত হয়ে দাঁড়াতো। আমাদের দোষ হচ্ছে—ও হয়ে যাবে·· যে কোনো রকমে হয়ে যাবে তার বেশী নয়···কি করে পারফেকশনে পৌঁছাবো সেদিকে লক্ষ্য কারোরই প্রায় নেই।

১১

রণমলজী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বাসায় ফিরলেন···তখনও কিন্তু পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত তো যায়ই নি বরং বেশ জোরদার রৌদ্রে চারদিক ঝলমল করছে।

মাখন সিং তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে আমাদের এক এক করে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করে যখন বুঝলেন ছবি তোলার কর্ণধার আমিই, তখন তিনি বললেন—মিঃ বোস, আপনার ছবির সবজেক্টটা কি নিয়ে···টারজানের মত কিছু?

আমি বলি—না, এই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়···ভারতীয়দের আফ্রিকা অভিযান।

পৃথিবীতে ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম আফ্রিকার বনাঞ্চলে পদার্পণ করেন ব্যবসা করতে···বিশেষ করে গুজরাত প্রদেশের কাথিয়াড়ী বণিকগণ। এঁরা ওদেশ থেকে গন্ধদ্রব্য, রাঁধবার মসলা, লবণ ইত্যাদি নিয়ে এদেশে এসে বাটা সিস্টেমে এদেশ থেকে হাতীর দাঁত, সিংহের নখর ও নানারকম জন্তু জানোয়ারের চামড়া···দামী দামী ধাতু···যেমন সোনা, হীরা, ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম থেকে শুরু করে টিন, ম্যাঙ্গানিজ পর্যন্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন···এবং এর জন্যে অরণ্যসংকুল ভয়াবহ জীবজন্তু, সাপ সরীসৃপাদি, কীটপতঙ্গ, ভীষণ ভীষণ নরখাদক বিভিন্ন জংলী মানুষদের সম্মুখীন হতে হোতো···কত রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করতে হোতো···কত কত নদ-নদী পাহাড়পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে জীবন নিঃশেষ করে এই ব্যবসাসূত্র প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন!···এই পরিপ্রেক্ষিতেই এক ডকুমেণ্টারি ছবি···অথচ ঔপন্যাসিক প্রেমবিরহের মাধ্যমে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

টারজনের মত এতে রূপকথার স্থান নেই।

রণমলজী বলেন—এ কাজ সর্বপ্রথম যখন গুজরাতের কাথিয়াড়ী বণিকরাই করে গেছেন···আমি তাদেরই বংশধর···কাজেই আমার কাছ থেকে যথাসাধ্য সাহায্য আপনারা পাবেন। তবে 'রৈঞ্জুরু'তে আপনারা ঠিক কি ছবি নিতে চান আমায় বলবেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বুঝলাম আমরা যে জায়গায় পদার্পণ করেছি তার নাম 'রৈঞ্জুরু'। রৈঞ্জুরু থেকেই বোধহয় রিয়ঞ্জারো পর্বতমালার নামকরণ হয়েছে। রিয়ঞ্জারো পর্বত-পাদদেশে এই জায়গার অবস্থিতি তাই এইখানকার নাম রৈঞ্জুরু হয়েছে।

আমি বললাম—আপনি এই ফিরলেন···কিছুটা সুস্থ হোন তারপর রাত্রে একসঙ্গে বসে আপনাকে আমাদের 'কি কি চাই' এর ফর্দ দেবো।

উনি হাসলেন।

কফি এসে পড়লো। সবাই এক টেবিলে বসে কফি সেবা করা হোল। কফি খেতে খেতে সর্দারজী গুজরাটী ভাষায় রণমলজীর সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলেন। বুঝলাম···ব্যবসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে।

আমি বলি—মিঃ রণমলজী···

উনি কথা কেটে বলেন—আমায় মিস্টার বলবেন না, বলবেন রণমলভাই···

আমি বলি—ও আচ্ছা। আচ্ছা আপনি এখানে এমন নির্বান্ধব পুরীতে থাকেন কি করে? তা ছাড়া আপনার সঙ্গীদের দেখলেই তো ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

উনি বলেন—ঠিক এই জায়গাটা হয়ত নির্বান্ধব পুরী, তবে নৌকা করে এলবার্ট লেকের দিকে আরও কিছুটা এগোলেই রয়েছে "ফোর্ট পোরট্যাল"। প্রায় শহর

বলাই চলে। মানুষের জীবনের যাবতীয় দ্রব্যই সেখানে মিলে যায়, তাছাড়া নিঃসঙ্গতাও কিছু কিছু ঘুচে যায়। আমি তো আজ তিনদিন পরে ওখান থেকেই ফিরছি। তারপর বলেন—আপনাদের ফিরতিপথ বোধহয় "ফোর্ট পোরট্যাল" কি বলেন সর্দারজী?

সর্দারজী উত্তর দেন—"ফোর্ট পোরট্যাল" হয়ে ফেরার ইচ্ছা। নইলে লেক এলবার্টে নেমে যেতে গেলে দশ পনর দিন লেগে যাবে। তা ছাড়া শুধু শুধু এঁদের আর অত কষ্ট দিতেও চাই না।

ফোর্ট পোরট্যাল থেকে ইউগাণ্ডার পথে ফিরে যাবার রাস্তা আছে এবং সে রাস্তা খুবই সুন্দর। তবে বোটে এসেছি, তাই বোটম্যানেরা বোট নিয়ে কোথায় যাবে তাই ভাবছি।

রণমলজী বলেন—বলুন মিঃ বোস কি খাবেন রাত্রে···

রণমলজী বলেন—বোট লেক জর্জের না কাজিঙ্গা চ্যানেলের।

সর্দারজী বলেন—কাজিঙ্গা চ্যানেলের।

—ওঃ তাহলে ওদের আমি ধরে নেবো ফোর্ট পোরট্যাল থেকে। আমার কিছু লগ্ পাঠাবার রয়েছে "বারবারায়"। ফোর্ট পোরট্যালে আপনাদের ছেড়ে দিয়ে লগ্ তুলে নিয়ে ওরা ফিরে যাবে। আর আপনাদের দলকে মনিভাই-এর লরী করে "মরোঙ্গোতে" পাঠিয়ে দেবো। সতের মাইল পথ যাবে আর আসবে।

আমি ভাবছি···এই তো সবে এসে পৌঁছেছি···এরি মধ্যে ফেরার প্রোগ্রাম···তবু রণমলজীর প্রোপোজাল ভালই লাগলো। ভাবলাম নৌকায় ঐসব ডেঞ্জারাস পথ দিয়ে আর ফিরে যাব না।

গত রাত্রের টঙ্কারটা হঠাৎ এসে বুকে যেন ঘা দিয়ে উঠলো। নিজে নিজেই শিউরে উঠলাম!

রণমলজী বলেন—বলুন মিঃ বোস কি খাবেন রাত্রে···আমিষ না নিরামিষ··

আমি বলি—আপনি গুজরাত প্রদেশীয়, কাজেই নিরামিষাশী নিশ্চয়ই…

উনি উত্তর দেন—জাতিগত সংস্কারে আমাদের তাই উচিত, তবে এই জঙ্গলে সব সংস্কার কি বজায় রেখে চলা যায়…তাই যখন যা সুবিধে হয় তাই খাই…

আমি বলি—আমাদেরও তাই…যা সুবিধামত পাবেন তাই খাওয়াবেন।

উনি বলেন—এখানে জঙ্গল-পটাটো (মেটে আলু) হয়, তাছাড়া ভেণ্ডি, ঝিঙা সবই কিছু কিছু হয় তাই নিরামিষেও অসুবিধা নেই, কিছু কিছু মছলিও পাওয়া যায়, আপনি বাঙ্গালী আছেন মছলি খেতে ভালবাসেন…মছলিও খাওয়াতে পারবো। তবে মান্‌সোটা কাল জঙ্গলে না গেলে টাটকা মান্‌সো মিলবে না তো।

আপ্যায়িতের হাসি হেসে উঠলেন। বললেন,—হ্যাঁ এখানে ফল খুব ভাল আছে…

আমি বলি—কি ফল ?

উনি বলেন—বদ্দি ফল, মাইনে সারা ফল। আম বলুন, আনারস বলুন, কেলা, চিক্কু সবই পাওয়া যায়…তাছাড়া রাফফিয়া আম…মাইনে খেজুরই বলুন…এখানে খুব পাওয়া যায়।

ব্যানার্জি সাহেব বলেন—এ তো দেখছি 'গার্ডেন অফ ইডেন'।

সবারই মুখে মৃদু হাসি।

রণমলজী ওদেশী ভাষায় ডাক দিলেন। ওর পেয়ারের চাকর বুশম্যান সর্দার এসে হাজির হোলো। উনি তাকে কি কি যেন বললেন। সে বহুৎ আচ্ছা বানাকুবা বলে সেলাম জানিয়ে বিদায় নিল।

রণমলজী চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—"নীলাঞ্জী মটোমারু"…

বুশম্যান সর্দার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—"বহুট্ আচ্ছা বানাকুবা"

আমি ঔৎসুক্য সুরে বলি—নীলাঞ্জী মটোমারু মানে কি রণমল ভাই ?

উনি মৃদু হেসে উত্তর দেন—ওরা মাছ ধরতে যাচ্ছে, এখানে একটি ওদের জাতের মেয়ে থাকে…তার নাম নীলাঞ্জী—তাকেও সঙ্গে নিতে বললাম।

—চলুন পিছনের নদীর পারেই মাছ ধরবে…দেখবেন চলুন।

সবাই উঠে পড়লাম। আমি মনে মনে জংলী মেয়েটার নাম পুনরাবৃত্তি করলাম—নীলাঞ্জী ! (ক্রমশঃ)

* * *

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

বর্শা বিঁধে ওরা মাছ ধরে।

অব্যর্থ টিপ···জলের তলায় মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে···অথচ তীর থেকে বর্শা ছুঁড়ছে···ঠিক বিঁধে যাচ্ছে ওদের গায়ে।

বুশম্যান সর্দার মৎস্য শিকারের হিরো···আর···

নীলাঞ্জী হচ্ছে এই শিকার উৎসবের হিরোইন।

বর্শা লাগার সঙ্গে সঙ্গে জল-নেউলের মত ও জলের তলায় তলায় ডুবে চলে যাচ্ছে এক নিমেষে।

আর জল-নেউলকে আমরা বাংলায় বলি ভোঁদর।

নীলাঞ্জী জলের ওপর ভেসে উঠে মাছ আর বর্শাটাকে তেমনি নিমেষেই ছুঁড়ে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে প্রায় পনের ষোলটি একহাত লম্বা মিরগেল মাছের মত মাছ জড়ো হয়ে উঠলো তীরে।

রণমলজী বললেন—বিগ্ সাডিন্স।

আমি বলি—সাডিন মাছ শুনেছি সামুদ্রিক।

রণমলজী বলেন—সামুদ্রিক সাডিন নোনা মাছ···এগুলো মিঠে মাছ···যেমন আপনাদের কলকাতার গঙ্গার ইলিশ আর বেনারসের ইলিশ, স্বাদের তফাৎ হবে, তবে নট এ ব্যাড্ টেস্ট্।

ফিরে এলাম সবাই ক্যাম্পে আমার চোখের সামনে নীলাঞ্জীর সাঁতারের তৎপরতা তখনও ভাসছে···

বললাম—এবার এগুলোকে রাঁধবে কি করে?

রণমলজী হেসে উত্তর দেন—রোস্ট হবে—মাছভাজা মিলবে না।—বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমি বলি—আপনি বাংলাদেশের মাছ খাওয়ার ব্যবস্থার রীতি জানলেন কি করে?

উনি বলেন—চার বচ্ছর কলকাতাতে ছিলাম যে···

—তাই নাকি? কলকাতায় কি করতেন?

—জাহাজে রসদ সাপ্লাই দিতাম।

* * *

রাত্রে জংলী তক্তার বেঞ্চির সামনে বেঞ্চি পেতে ডিনার টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে। তার উপরই আমাদের সারা দলটি রণমল ভাইকে ঘিরে বসেছি।

রণমলভাই গল্প করছেন।

মাছ আর বর্শাটাকে নিমেষেই ছুঁড়ে দিচ্ছে। [পৃষ্ঠা ৬৫৮

—এখানে, মানে প্রপার রৈঞ্জুরুতে যে সব পিগমীর দল থাকে, তারা বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের শাসনে একটু সভ্যতার আলো দেখতে পেয়েছে···অর্থাৎ এক কথায় নরখাদকবৃত্তি ছেড়েছে।

বনের পশুর মাংসই এখন এরা খায়।

বুশম্যানরা আবার এদের চেয়েও আরও একটু এন্‌লাইটেনড্ বলা যেতে পারে। কারণ, এদের অনেকেই ক্রিশ্চান হয়ে চার্চেটার্চে যায়, কিন্তু পিগমীরা এদের মত আজও ধর্মান্তর ঘটায় নি।

এরা পূজা করে বনের মধ্যে ওদের ভূত দেবতাকে আর অগ্নিদেবতাকে। এরা ভূত প্রেতে খুব বিশ্বাসী।

ভূত বলতে আমাদের দেশের মৃত-আত্মাদের পুনঃ প্রকাশের মত নিয়ে নয়···

এদের ভূত হচ্ছে জঙ্গলের ভূত। ধরুন হঠাৎ একটা গাছ যে কোনো অজানিত কারণে মড়মড় করে ভেঙে পড়লো···অমনি ওরা ভূতের পূজো করতে লেগে গেল। ওদের ধারণা ওটা ভূতেই ভেঙেছে। হঠাৎ প্রকৃতিতে যদি এমন এক দুর্যোগ এলো যা সাধারণতঃ ঘটে না···ওরা বলবে ভূতে ঘটিয়েছে···

ভূত পূজোর আবার মন্ত্রতন্ত্র আছে।

এদের পূজা করবার জন্যে আছে একদল পূজারি। তাদের জাদুকরও বলা চলে আবার পুরোহিতও বলা চলে। কোন অঘটন ঘটলে এদের "রায়ই" হচ্ছে পরম "রায়"। সেই রায় অনুযায়ী এরা নানান রকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রক্রিয়া রচনা করতে শুরু করে দেয়।

এর জন্যে বড় উৎসব হয়…পূজায় উৎসবে বলি পর্যন্ত হয়। তবে আমাদের দেশের মত পশুকে খাঁড়া দিয়ে কাটা হয় না…এরা জ্যান্ত পশুকে হাত পা বেঁধে একটা বড় রোলার সংলগ্ন করে আগুনের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। সেই জ্যান্ত পশুর চিৎকার আর গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে ওরা গাছের রস খেয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে ওঠে…নাচ থামলে পোড়ামাংস দেবতাকে আর পুরোহিতকে উৎসর্গ করে নিজেদের খাবার আসর বসায়।

আমি বলি—রেঞ্জরু ছাড়াও কি বন্য পিগমীদের এখানে দেখা যায়?

উনি বলেন—কচিৎ কখন এসব জায়গায় তারা বেরিয়ে আসে। বন্দুকের ভয় আছে তো …তাই তারা ঘন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

নদীর ওপরের স্রোতে, একটা খালই বলুন, বনের মধ্যে ঢুকে গেছে বহু দূর…এই শাখানদীতে কুমির অসংখ্য। পার হয়ে যেতে গেলে অনিবার্য মৃত্যু…

কুমিরসংকুল নদীর বেড়ার ওপারের ঘন জঙ্গলেই ওদের আনাগোনা বা বাস বলা যেতে পারে।

দেশী লোকেরা এই নদীকে লতার ঝোলা ধরে ঝুল নিয়ে পারাপার করে…তখন মাথা উঁচিয়ে কুমিরগুলো মুখব্যাদান করতে থাকে। অথচ…

হঠাৎ থেমে যান রণমল ভাই। যেন কি বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকেন।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন—অথচ এদের কাছেই আমাদের দরকার।

বললাম—কেন? কিসের দরকার?

—ওদের কাছ থেকে হীরে, প্ল্যাটিনামের টুকরো, হাতির দাঁত, সিংহের নখ এমনি বহুরকম দামী দামী জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি সোৎসাহে বলি।

—আমাদের ছবিতে এই রকমই একটা সিকোয়েন্স রেখেছি। আমাদের শেঠজী রণমলজীকে হীরের খোঁজে পিগমী এরিয়ায় পাঠিয়েছেন,…রণমলজী মানে আপনি নন… আমাদের কাহিনী হিরোর নামও রণমলজী।

আজকে আপনার ঐ নীলাঞ্জী মেয়েটাকে দেখে ভাবছিলাম…ঐরকম এদেশীয় একটি মেয়েকে হীরোর সাথী করে পিগমীর দেশে পাঠানো চলে কিনা…যে রণমলজীকে জঙ্গলের পথ দেখিয়ে নিয়ে হীরা সংগ্রহে সাহায্য করতে পারে?

রণমলভাই নিশ্চুপ…আমার মুখের পানে চেয়ে থাকেন।

কথার জবাব দেন না।

পরে ধীরে ধীরে বলেন ওকে দিয়ে সত্যিই আমরাও ঐ কাজ করিয়ে থাকি। তবে বলি শুনুন—পিগমীদের মেয়েরা পুরুষ পিগমীদের চেয়ে অনেক ভয়ংকর…তাই…

মানে ওদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলছি…তাই—

পিগমীরা এই বুশম্যান গার্ল পেলেই ভুলিয়ে নিয়ে নিজেদের ঘরণী বানিয়ে নেয়…

এই সুযোগটুকু নিয়ে আমাদের নীলাঞ্জীকে কাজে লাগাই। নীলাঞ্জী খুব হুঁশিয়ার মেয়ে…তার উপর নাচে গানে অদ্বিতীয়া। সাঁতারে ওর সমতুল্যা সাঁতারু এখানে বিরল… সে তো আপনি নিজে চোখেই দেখলেন।

এছাড়া ও এদেশে রূপসীর মধ্যেই গণ্যা…কাজেই ওকেই বিশেষ বিশেষ কাজে লাগানো ছাড়া পথ পাই না…

ও মেয়েও এমন ওস্তাদ, যে কাজেই ওকে পাঠাও না কেন সেকাজ ফতে করে তবে ক্যাম্পে ফিরবে।

কাজ যদি না সম্পন্ন হয়…তবে ও ক্যাম্পে ফেরে না।

একবার ও প্রায় পনের দিনের ওপর ক্যাম্পে ফিরল না। আমরা ভাবলাম নিশ্চয়ই ওর কোনো বিপদ হয়েছে।

এক, হয়ত কোনো জন্তু-জানোয়ারের মুখে পড়েছে…নইলে হয়ত কুমিরের পেটে গেছে…নইলে—,

পিগমীরা ভুলিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ওকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে।

কিন্তু…না ও ঠিক কাজ হাঁসিল করে ক্যাম্পে ফিরে এলো।

আমি বলি—তাহলে বলুন গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক…আমরা মনের ভাবনাটা কার্যকরী হতে পারে।

উনি বলেন—তা হতে পারে।

আমি বলি—একটা মুশকিল হবে আমাদের হিরো নয়…হিরোর বিশ্বাসী চাকর ভুলুয়াকে সঙ্গে দিয়ে ওকে পাঠানো হবে যেন, …কিন্তু দুজনে দুজনকার কথা বুঝবে কি করে?

মাখন সিং বলেন—সে আমি মিঃ মিত্তিরকে কালই একটা ভাষার লিস্ট লিখিয়ে দিচ্ছি… সেগুলো জঙ্গলে প্রায়ই দরকার হয়। যদি মিত্তির সাহেব মুখস্থ করে ওইগুলোই আওড়ে যান তাহলে নীলাঞ্জী বুঝে ফেলবে।

আমি বলি—তাহলেও সেটা তো হবে এক তরফা। মিত্তির যদি কিছু জানতে চায়…ও কি ভাষায় জানাবে?

রণমলভাই বলেন—সেটা আমি নীলাঙ্গীকে শিখিয়ে দেবো যে মিত্রমহাশয়ের প্রশ্নগুলো ও যেন করকে দেখায়াঙ্গে মানে করে দেখায়।

তারপর বলেন—আপনার সিকোয়েন্সটা ঠিক করে লিখে ফেলুন, তারপর বসে বসে প্ল্যান করা যাবে···কি করে কি হবে।

খাওয়ার মধ্যপথে নজর পড়লো সেই মাছের রোস্টের দিকে। মনোযোগ সহকারে তা খেতে গিয়ে বুঝলাম স্রেফ মাছপোড়া। বলি—মাছ পুড়িয়ে মীরচি আর নুন দিয়ে তা বেশ ভাল লাগে দেখছি।

রণমলজী হাসলেন···বললেন—

—কি জানেন মিঃ বোস, জঙ্গলে ভাজাভাজি চলে না···তরকারি রান্নাও চলে না··· অধিকাংশ জিনিসই আমরা এমনিতর রোস্ট করেই খাই। ভাবুন না আজ প্রায় চোদ্দ বছর রুটিই খাই···ভাজার ভয়ে পুরি খাওয়া জোটে না।

নীলাঙ্গী দাঁড়িয়ে ফ্যাকফ্যাকে সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসছিল···যেন ও আমাদের ভাষার সবটাই বুঝে ফেলেছে।

রাতের অন্ধকারে দূরের পেট্রোমাক্সের আলোয় কেমন একটা আধ আলো আধ ছায়ায় চারদিক ঝাপসা দেখাচ্ছে। তার মধ্যে ওর ঐ সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখে মনে পড়ে গেল কবি জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দের পদাবলী···

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমিরম্ অতি ঘোরম।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলছেন—যদি তুমি কথা বল—তাহলে দন্ত-রূপ শ্বেতচন্দ্র আমার মনের অতি ঘোর অন্ধকারকে হরণ করবে···

এ যেন ঠিক তাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে টেন্টে আসার জন্যে রণমলভাইএর পাকা ক্যাম্প থেকে পা বাড়িয়ে বুঝলাম···এখানকার রাতের রূপ!

কথাবার্তার আড়ালে এতক্ষণ এ রূপ আমাদের চোখের অন্তরালেই ছিল···তা এখন চোখের ওপর প্রকট হয়ে উঠলো।

অদূরে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। আগুনের শিখায় দুলে দুলে উঠছে অবিন্যস্ত চাপবাঁধা অন্ধকার। তারই মধ্যে কালো কালো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহারাদাররা··· হাতে বর্শা।

বনের উল্লাস ঠিক তেমনি যেমন বোটে আসার সময় ছিল। একদিকে ঝিঁঝির ঝাঁঝর বেজে চলেছিল···অপর দিকে হুকুম পেঁচাদের বিকট চিৎকার···

অঙ্গনে পা রেখেই বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল।

জঙ্গলের দিক থেকে একটা বিকট চেটাৎ-চেটাৎ আওয়াজ—যেন হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার তুলে থেমে যাচ্ছে।

সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলাম—ওটা কিসের আওয়াজ?

সর্দারজী বলেন—ও বুশমেনদের খবরদারী।

বুশম্যানদের খবরদারী?

হ্যাঁ···ওরা গাছের উঁচু উঁচু ডালে বাঁশের একরকম পশুপাখি তাড়ানোর যন্ত্র বেঁধে রেখে তাতে ঘা দিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম—ব্যা পা র টা কি?···

উনি বলেন—তল্লা ফাঁপা বাঁশের আগার দিকে চিরে তাকেই সুতলী রশি বেঁধে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। সেটা আসল বাঁশের গায়ে লেগে অমনি চটাৎ-চটাৎ আওয়াজ করছে। এ আওয়াজে যেমন আপনাদের মত আগন্তুকরা চমকে উঠছেন···তেমনি চমকে ওঠে বনের মাঝে উটকো জানোয়ার। এই আওয়াজের প্রতাপে ভয়ত্রস্ত হয়ে তারা পালিয়ে যায়। তাতে বিপদের শঙ্কা কম থাকে···তাই এই ব্যবস্থা।

ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহারাদাররা···হাতে বর্শা। [পৃষ্ঠা ৬৬২

বড় টেন্টটায় আমার আর সর্দারজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

পাশের টেন্টে সুধীর আর মিত্তির···আর অনতিদূরে পাকা ক্যাম্পের ঘরে শুতে গেলেন, আলিভাই, ব্যানার্জি, মিঃ সা-রা। টেন্টের বিছানায় বসে মাখন সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা বুশম্যানরা কি পিগমীদেরই একটা জাত?···

উনি শয্যা নেবার ব্যবস্থা করতে করতে বললেন—না, এরা হচ্ছে প্রধানতঃ কালা-হারি মরুভূমি আর দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার আশে পাশে "খুয়াই" গ্রুপ। এদের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের গ্রুপদের "সান"-ও বলে।

এরা পিগমীদের মত অত ছোট বেঁটে নয়। এই ধরুন···অ্যাভারেস্ট হাইট এদের

সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট হবে। এদের ভাষার নাম "বান্টু" ভাষা···কারণ, এরা বান্টু-ভাষাভাষী জাতের মেয়েদের বিয়ে করে।

এদের গায়ের রং সাধারণ পীত কালো···কারো কারো বা জলপাইয়ের রঙের মত···

এদের মেয়েগুলোর মাথা ছোট আর পেছুটা চ্যাপ্টা···যেমন নীলাঞ্জীর দেখলেন। নাকের পেড়োগুলো ভীষণ চওড়া···গালের চোয়ালের হাড়গুলো উঁচু এবং ঠেলা আর কপালটার কাছে ঢিপির মত উঁচু।······

মাথার চুলগুলো ছোট ছোট···তাও আবার পাকিয়ে পাকিয়ে কেমন গোল হয়ে কুঁচকে থাকে···যেন মাথাভর্তি কালোমরিচের দানা লাগানো···চোখ দুটো নীলাঞ্জীর মত লম্বা চেরা—জোর করে চেয়ে আছে···তাই মনে হয় চোখে যেন কী মায়া মাখানো।

এদের সংসারে একই পুরুষের বহু পরিবার···অর্থাৎ মেয়েজাত পুরুষজাতের চেয়ে সংখ্যায় এদের বেশী, তাই এক একজন চারটি পাঁচটি করে বিয়ে করে। এবং এ দলের ছেলেরা বড় হলে এই দলে মেয়ে পেলেও বিয়ে করতে পারে না···

সেইজন্যে এদের ঘরের মেয়েরা অনাদৃত হয়ে প্রায়ই পিগমীদের পাল্লায় গিয়ে পড়ে···পিগমীদের সঙ্গে ঘর বাঁধে।

এই সব পরিবার জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ায়···যাদের বলা চলে "হান্টিং ব্যাণ্ড"···

একই ব্যাণ্ডের মধ্যে একটিই বিবাহিত গ্রুপ থাকে। এদের এই সব ব্যাণ্ডের সর্দার বলে কেউ নেই···স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যার বয়স বেশী···তাকেই সবাই মেনে চলে।

এরা অগ্নির উপাসক নয়। এরা পূজা করে চাঁদকে···তাই মাউণ্ট অফ দি মুনের নিকটস্থ অধিবাসীরা নিজেদের খুব পুণ্যাত্মা মনে করে।

এদের জাতের পূজাপার্বণ আনন্দের কোন নির্ধারিত দিন তারিখ নেই। কারণ, এরা সবসময়ই সারা বনে ছড়িয়ে থাকে গ্রুপে গ্রুপে শিকারের সন্ধানে আর পথের সন্ধানে।

কাজেই, এদের বাড়ি ঘরে বাস করার সময় নেই।

সময় পায় বর্ষা নামলে।

এদেশে বলেছি বছরে দুবার বর্ষা···আর দুবার গ্রীষ্ম বা শীত।

এই বর্ষার সময় সমস্ত গ্রুপ দলে দলে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে নিজেদের পরিত্যক্ত বস্তিতে।

মাসাধিক পরিত্যক্ত বস্তি তখন নতুন করে পাতা দিয়ে ছেয়ে মেরামতি করে এরা ঘর বাঁধে, পূজাপার্বণের উৎসব করে।···আবার বর্ষা অন্তে একটি করে পুরুষ তার পরিবারবর্গ ছেলে পিলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নতুন সংগ্রহ ও শিকারের অনুসন্ধানে।

পূজাপার্বণে এরা ছড়া গান গায় চাঁদের উদ্দেশে। সে সংগীত খুব মিষ্টি আর শ্রবণসুখকর।

দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে ছিল আদি বুশম্যানদের বসতি। এখন এরা এসে জুটেছে এই মাউণ্ট অফ দি মুনের তলার বিভিন্ন জঙ্গলে।

শ্বেতাঙ্গরা···ভারতীয় বিদেশীরা তাই বুশম্যানদের সাহায্যেই বনসম্পদ সংকলনে সহায়তা পায়, পরিবর্তে ওদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়।

আসলে কিন্তু ওদের যত কিছু সংকলন পিগমীদের সম্পত্তি লুঠতরাজ করে।

পিগমীরা গভীর জঙ্গলের বনচর···তাই বনের অন্তস্থ সম্পদ ওরা যত পায় বুশম্যানরা পায় না!

তবে ওরা স্ত্রীরত্নের বিনিময়ে পিগমীদের কাছ থেকে অন্য রত্ন কেড়ে নেয়।

পিগমীদেরও আদিম ইতিহাস খুঁজতে গেলে জানা যায় যে এদের দল সারা পৃথিবীর বিষুবরেখা ধরেই বাস করে আসছে যুগযুগ ধরে। এসিয়া, আফ্রিকা, গ্রেসের "ক্যাটজী" পিগমীরা পুরাকালে বিখ্যাত ছিল।

আমি চুপ করে শুনছিলাম···হঠাৎ স্মরণ হলো হোমার লিখিত ইলিয়েড বইয়ের কথা···তাই বলি,—জানেন সর্দারজী ইটালীর হোমার সাহেব লিখিত ইলিয়েড পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম এই পিগমীদের নাম। উনি লিখেছিলেন ইলিয়েডে, যুদ্ধের সময় হঠাৎ সাক্ষাৎ পেলেন আড়াই ফুট তিন ফুট উঁচু এক মানুষ আকৃতির ভয়ংকর রাক্ষসদলের···তারা নাকি সুদূর দক্ষিণ দেশের অধিবাসী···যে দক্ষিণদেশ থেকে মেডিটেরিয়ন কোস্টে আসে রাশি রাশি সারসপাখি আর বন্যমাছি।

অন্য কি একটা বই-এ পড়েছিলাম···পিগমীদের সঙ্গে জঙ্গলের রাক্ষুসে পাখিদের লড়াই···

মাখন সিং বলেন—রাক্ষুসে পাখী হচ্ছে "বাস্টার ক্রেটার"। এদের সঙ্গে পিগমীদের আজও লড়াই হয়ে থাকে। পৌরাণিকরা বলেন, এই বাস্টার ক্রেটারদের প্রপিতামহেরা ছিলেন বকপাখি।

আমি বলি,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আরব্য উপন্যাসে এ পাখির নাম শুনেছি কিন্তু সে তো কাল্পনিক মাত্র।

সর্দার বলেন—আফ্রিকার জঙ্গলে যুগ যুগ আগে সে সমস্ত জন্তুর অস্তিত্ব ছিল আজ তার অনেক একস্‌টিন্‌ট্‌ হয়ে গেছে, তবে বড় বড় ঈগল পাখি ভেড়া ছোঁ মেরে নিয়ে তো আজও যায়। তেমনি এই বকপাখি প্রায়ই এই সব আড়াই তিন ফুটের মানুষগুলোকে ছোঁ মেরে আকাশে তুলে নিয়ে যেতো। এই নিয়ে ওদের মধ্যে দারুণ যুদ্ধের কথা শোনা যায়। ওদের জাতের গানের মধ্যে আজও তা পাওয়া যায়···তাই হয়ত বইয়ে পড়েছেন।

তবে আমরাও আনপড় হোয়েও অ্যারিস্টটলের গল্প শুনেছি, আমাদের ওস্তাদ

শিকারীর মুখে। উনি লিখে গেছেন যে 'বর্শাধারী ছোট্ট মানুষ রাক্ষসরা নাইল নদীর আশেপাশেই বাস করে।'

আবার এ গল্পও শুনেছি যে একবার পাঁচজন নাসামোনিয়ন পথিক আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি পার হয়ে নাইল নদীর ধার ধরে দক্ষিণে এসে দেখেছিল প্রচুর বনসম্পদ। তারা একদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ফল আহরণ করে বেড়াচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ বন থেকে একপাল পঙ্গপালের মত ছোট ছোট মানুষ এসে তাদের ঘিরে ফেলে। তারা এই পাঁচজনকে ধরে এক নদী পার হয়ে গভীর জঙ্গলে নিয়ে আসে—এ নদী নাকি ছিল কুমির ভর্তি এক জলস্রোত··· কাজেই বেশ বোঝা যায় যে আফ্রিকাতে এই পিগমীরা অত্যন্ত পুরনো অধিবাসী।

তবে শিকারীর বিদ্যা শিখতে আমাদের বনজগতের অধিবাসীদের নাম জানতে গিয়ে পেয়েছিলাম—পিগমীরা দুরকমের হয়। আফ্রিকান পিগমীর দলকে বলে নেগ্রিলোজ আর এসিয়াটিক পিগমীদের বলা হয় নেগ্রিটোজ।

নেগ্রিটোজদের পাওয়া যায় ফিলিপ্যান আইল্যাণ্ডে। আন্দামানে মালয় পেনিন্‌সুল'র "সিমাং"দের মধ্যে···যারা দুরাত্রিও এক জায়গায় বাস করে না।

সেমলিকির ধারে "ক্যামরুন" জাতেদের দেখে আফ্রিকান পিগমীদের ঘর বাঁধার উৎসাহ মিলেছে। তাই তারা ওদের মত বেখারির একদিক মাটিতে পুঁতে তাকে গোল করে ঘুরিয়ে অপরদিকটাও মাটিতে গেড়ে দেয়। এমনি করে একটা টোপের মত খাঁচা তৈরি করে জঙ্গলের পাতালতার ছাউনি দেয়।

তাতে করে বনের মধ্যে ওদের বসতিগুলো সবুজে সবুজে মিশিয়ে বুঝতেই পারা যায় না যে এখানে কিছু আছে।

তাই ওদের আক্রমণ অমন হঠাৎ বলেই মনে হয়।

আর,···

কালাহারী মরুর বুশম্যানরা উই ঢিবির মত গর্ত করে বাস করে, কখন কখনও পাখির বাসার মত প্রাকৃতিক লতাগুল্মের ঘন-নিকুঞ্জের মধ্যেই নিজেদের আস্তানা গাড়ে, আবার কখন জন্তুর চামড়াচ্ছাদিত ঝুপড়িতেও বাস করে।

সেণ্ট্রাল আফ্রিকার নেগ্রিলোজ পিগমীরা কিন্তু সেমলিকি উপত্যকার ক্যামেরুনদের মত পাতাঢাকা ঘেরাটোপেই আজও বাস করে থাকে।

জঙ্গলে ঘুরতে গেলে এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করে বুঝে নিতে হয় যে এ ঘরগুলি পিগমীদের কি বুশম্যান বা ক্যামেরুনদের।···কিন্তু এ শ্রেণীর সব ঘরগুলিই হয় নীচু···প্রায় জমির ওপর টোপের মত বসান—উচ্চতায় হয় ২২ থেকে ৩ ফুট।

হঠাৎ মিত্তির এসে আমাদের টেণ্টে ঢুকলো, বললো—কাল কি জঙ্গলে সুটিং হবে?

আমি বলি—না, কাল এই ক্যাম্পেই আর নদীর ধারে সুটিং শুরু করবো মনস্থ করেছি

···আজ রাত্রেই এর স্ক্রিপ্ট শেষ করে নিচ্ছি···কালকের দিন সময় পেলে রণমলভাই জঙ্গলে সুটিংএর ব্যবস্থা করতে পারবেন।

মিত্তির বললো—আজ তবে গুড্ নাইট্।

মিত্তির চলে গেলে আমি সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি বলেন সর্দারজী ···কাল ক্যাম্পেই সুটিং শুরু করাই ভালো···

কি সুটিং করবেন?

ধরুন···সাফারি পার্টি কিভাবে পিগমীদের ডেরায় পৌঁছাবে তারই নির্দেশ দিচ্ছেন শেঠ রণমলজী? তার পর রণমলজীর আদেশ অনুযায়ী ভুলুয়া নীলাঞ্জীকে আর দলবল নিয়ে হীরের খোঁজে নৌকাযাত্রায় পিগমীর দেশের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন···

এই হবে কালকের ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়।

(১৩)

সকালে উঠে চায়ের টেবিলে রণমলভাই আমার স্ক্রিপ্টের আদ্যোপ্রান্ত শুনে হেসে বললেন—তাহলে দেখছি আমাকেই আসল হিরো করে ফেলেছেন?

আমি হাসলাম।

সব গুছিয়ে নিয়ে স্নানাদি সেরে নাস্তা খাওয়ার পর সুটিং চালু হলো···

সুধীর বসু ক্যামেরায় আর শ্রীজগতাপ তার পোর্টেবল Audiocamex Recording Machine (অডিওক্যামাক্স রেকর্ডিং মেসিন) নিয়ে শব্দ তুলতে বসেছে···

সারা জঙ্গলকে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে রণমলভাইয়ের বাঁধা ক্যাম্পকেই সেটে পরিণত করা হয়েছে।

নীলাঞ্জনকে আমাদের ছবির জন্য যে পোশাক তৈরি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই সজ্জাভরণে সাজানো হয়েছে···তার হাতে বর্শা···টেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে নীরব পাহারায়···

ক্যামেরা স্টার্ট করল।

টেণ্টের মধ্যে থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে রণমলজী ভুলুয়াকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসেন ···বলেন,—হ্যাঁরে ভুলুয়া, খাবার-দাবার রসদ-পত্তর সব গুছিয়ে নিয়েছিস তো···কঙ্গোর জঙ্গলে আবার এককণাও খাবার মিলবে না মনে থাকে যেন?

ভুলুয়া উত্তর দেয়—হ্যাঁ জি, কুছু ভুলিনি। বারারা থেকে দোকানদার ভি খুদ আপনা হাতে সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে আমাদের বোটে তুলে দিয়েছে···

বললাম—কাট্।

ক্যামেরা থামলো। সুধীর আর জগতাপ দুজনেই বললে—O. K. (ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

(এদিকে সদার মাখন সিং তিনটি বন্য চৌকিদারদের নিয়ে নদীর ধারে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাদের তীরধনুক বর্শাদি সরঞ্জাম। ক্যামেরা ওদের উপর রক্ষিত। আবার শট্ শুরু হোলো)

সদারজী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—মিমি মটোয়াম্বা কাজা…

বয়রা সমস্বরে উত্তর দিল—জিজি বানাকুবা…

(রণমলজী এসে শটে ঢুকলেন)

সর্দারজী বলে উঠেন—রণমলজি ! আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দি…জঙ্গলে পা দিয়ে আর কথাবার্তা চলবে না। যা বলবেন ইশারায় বলে জানাবেন, নইলে বিপদে পড়ে যেতে হয়।

রণমলজী—তা আমার ঠিক মনে আছে সর্দারজী। হামার খালি ভয় হচ্ছে ন্যাকারাম ঢুলুয়ার জন্যে আর ঐ দেশী মেয়েটি নীলাঞ্জীর জন্যে, কখন কি করে বসে…

(শব্দ হলো কাট। আবার তুতরফ থেকে আওয়াজ এলো—O. K.। এবার নীলাঞ্জীর উপর ক্যামেরা। সর্দারজীর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সর্দারজী বলছেন—)

দেশী মেয়েটির সম্বন্ধে ভয় করবার কিছু নেই…জঙ্গলে ওরা সব আপনিই বুঝতে পারে…আপনি ওর কথা বুঝতে পারেন না বলে আপনার মনে হচ্ছে ও বোকা, কিন্তু প্রকৃতই নীলাঞ্জী তা নয়। অসম্ভব রকমের সজাগ—জঙ্গলের জানোয়ারদের মত। প্রকৃতির রূপ দেখেই ও বুঝে নেয় যে কোথায় কী ঘটতে চলেছে…

(আবার ক্যামেরা বন্ধ হলো—আওয়াজ এলো O. K.)

(ক্যামেরা আবার রণমলজী আর সর্দারজীর ওপর ন্যস্ত করা হোলো···তাদের মধ্যে ডায়লগ···)

রণমলজী—বটে ?

সর্দারজী—আমাদের শেঠজী যে কাল এতো হাতীর দাঁত সংগ্রহ করে ক্যাম্পে এনে ফেললেন তার মূলেও ঐ দেশী মেয়ে নীলাঞ্জী। (কাট্)···

(নীলাঞ্জীর ক্লোজ আপ। সর্দারজীর কথা ভেসে আসছে···)

জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও যেন হয়ে ওঠে—Goddess of the Jungle.

যাকে বলে বনদেবী···হা-হা-হা···(কাট্)

(নদীর ধার। দুতিনখানা দেশীয় নৌকা মাঝিমাল্লা সমেত তৈরী। যাত্রার অপেক্ষায় উন্মুখ। ভুলুয়া এসে নৌকায় পা দিয়েই চিৎকার করে ওঠে। নৌকাগুলো জলের মধ্যে নাগর-দোলার মত ঘুরপাক খেয়ে ওঠে। রণমলজী ছুটে এসে নদীর ধারে দাঁড়াল। তার পেছনে ছুটে আসে নীলাঞ্জী। হঠাৎ দূরে জলোচ্ছ্বাস আর অট্টহাসি···)

রণমলজী বলেন—ওকি ? কী ভয়ানক শব্দ ?

নীলাঞ্জী খিলখিল করে হেসে বলে—ডরো মট। বানাকুবা···কিনাকো—কিবাকো—উসি কিবাকো···

রণমলজী বলেন—এই ভুলুয়া নৌকা থেকে নেমে পড়···কি ভয়ানক হিপোপটেমাসের দল! ওরা যদি একবার নৌকার দিকে এসে ঢুঁ মারে তো নৌকা বানচাল হয়ে যাবে। (কাট)···

এমনি করে এগিয়ে চলে আমাদের ছবির কাজ···শটের পর শট্···সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে মোট দশটি শট্ নেওয়া হোলো।

রণমলভাই বলেন—যা নিলেন, তা সব ঠিক ঠিক হোলো তো !

আমি বলি—আপাততঃ ঠিক···তবে রাত্রে সুধীর টেস্ট দেখে তবে রায় দেবে !

—আর—সাউণ্ড ?···মানে যেসব কথাবার্তা তোলা হোলো ?

আমি বলি—ওগুলোরও একটু টেস্ট বের করে দেখে নেবে।

রণমলভাই বলেন—শোনা যাবে ?

আমি বলি—না, শোনা যাবে না···তবে ছবির সেলুলয়েডে কথার ভাইব্রেশনগুলায় দাগ ঠিক ঠিক উঠেছে কিনা তা দেখে নেওয়া হবে।

এখনকার মত সেদিনে টেপ রেকর্ডিং ছিল না। টেপ রেকর্ডিংএ আওয়াজ তুলে সঙ্গে সঙ্গেই শুনে নেওয়া যায়, কিন্তু ফিল্ম রেকর্ডিংএ সে সুযোগ ছিল না। শুধু ট্র্যাক লাইনের

ফোটোগ্রাফিক এক্সপোজার দেখে বুঝে নিতে হোতো···পরে লেবরেটারীতে ধোয়ার পরে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ বার করে তবেই শোনার ব্যবস্থা করা হোতো।

রাত্রে সুধীর টেস্ট বার করে আমাদের জানালো যে টেস্টগুলা সব ঠিকঠাক আছে···

রণমলজী আর সর্দারজী বলেন—এ আর এক নতুন রাজত্বের সঙ্গে চেনাজানা হচ্ছে···ভারী ইন্টারেস্টিং।

আবার সেই আওয়াজ।

'উল্লা হো···উল্লা হো—হুইল্লাল্-লা—হুল্লাল্-লা—হুল্লাল্-লা !'

রৈঞ্জুরুর সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে দিচ্ছে সেই হেঁড়েলী গলার সুরেলা দাঁড়িদের গানে···তার সঙ্গে তিনখানি নৌকার ত্রিশখানি দাঁড়ের ছপছপ শব্দ।

প্রথম নৌকার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছেন সর্দারজী, রণমলজী। দুজনের হাতেই ধরা রয়েছে বন্দুক···

মাঝের নৌকায় দেখা যাচ্ছে ভুলুয়া আর নীলাঞ্জীকে।

আর, সবার শেষের নৌকায় দেখা যাচ্ছে তীর ধনুক হাতে দশজন বুশমেনকে।

নৌকাগুলো উজান বেয়ে চলেছে···তবু গতি তাদের কম নয়···

তীরের বুকে পড়া জঙ্গলের পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড়···

যেন পাহাড়ী গ্যালারি।

সবার পেছনে রজত মুকুট মাথায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে মাউণ্ট অফ দি মুনের তুষারধবল চূড়াত্রয়···

এর পাশে পাশে যারা চলেছেন···তাদের খবর কেউ রাখেন না। অথচ তারা না থাকলে এ সংগীত, এ দৃশ্যাবলী আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির বুকে যেমন চিরদিন ন্যস্ত তেমনিই থেকে যেতো।

পাহাড় আর জঙ্গলের পাল্লা দিয়ে দৌড় চলেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বালি হাঁস নৌকার তাড়ায় আকাশপথকে ছেঁকে ধরেছে।

দাঁড়ের শব্দে হুসহুস করে মাথা তুলে উন্মাদ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুপাশের কিবাকোর দল। তারা চকিত চাহনিতে এ দৃশ্য দেখে নিয়ে ডুব মেরে দৌড়চ্ছে পাশের জঙ্গলতীরে। তাদের পিঠের নিশানা জলস্রোতের মাথায় মাথায় দেখা যাচ্ছে।

শাখানদীর মোহনা এসে পড়েছে।

একখণ্ড বন্য জমি হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে। সে জমিতে উঁচু

উঁচু আকাশ-ছোঁয়া বনস্পতির দল। তাদের গা বেয়ে বেয়ে নেমে এসেছে বনলতার লম্বা লম্বা শুঁটি···যেন ঐ বিশাল বনস্পতির মাথা থেকে জটাজাল নামিয়ে দিয়েছে।

বাঁকের মুখে নৌকা ঘুরে ঘুরে জলস্রোতে ঘূর্ণি রচনা করছে···এমন সময় গগনভেদী চিৎকার।

মেয়ে কণ্ঠের চিৎকার—বানাকুবা মগর······

এ কি নীলাঞ্জীর কণ্ঠস্বর ?

আওয়াজ হোলো দুম্—দুম্—দুম্···

স্রোতের মুখে জলস্তম্ভের মত জল স্ফীত হয়ে উঠলো। তারপর সারা নদীটায় যেন রক্তস্রোত বইতে লাগলো!

ঝপ্—ঝপ্—ঝপ্···

জলে ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়লো কারা? ও, ওরা যে বুশমেনের দল···হাতে তাদের দোধারী বর্শা···

জল তোলপাড় করে দু' দুটো কুমির আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে।

সেই অবস্থায় দোধারী বর্শাগুলো বিঁধে যায় পটপট করে তাদের গায়···

দেখতে দেখতে জলে কুমির চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে।

বুশমেনদের কোমরের কুকরীর মত ধারালো ছুরিগুলো কুমির দুটোর পেটদুটোকে চিরে ফালফাল করে দিল।

আবার রক্তস্রোতে জল লাল হয়ে উঠেছে।

জলে ডোবা ছোট ছেলেদের জল থেকে যেমন একহাতে উঁচু করে তুলে তীরে নিয়ে আসে তেমনি মগর দুটোকে হাতের ওপর ধরে উঁচু করে বুশমেনরা নৌকায় এনে তুললো।

রণমলজী বলে ওঠেন—আম্মি···আম্মি···মগর খাল···মিটাকে···

ভুলুয়া পাশের নৌকো থেকে ধেই ধেই করে নেচে উঠে হাতে তালি বাজিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ করে—ক্রু···ক্রু···ক্রু···

সঙ্গে সঙ্গে হুস হুস করে আবার জল থেকে মাথা তুলে আকাশপানে লাফিয়ে ওঠে কিবাকোর দল।

সর্দারজী বলেন—ঐ দেখুন রণমলজী···দুটো কিবাকো উন্মুক্ত আকাশের দিকে মুখ ব্যাদান করে পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্য জানাচ্ছে। এ সময় যদি শিকারীর গুলি ওদের ওপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং ফলে যদি একটি নিহত হয়···তবে কেন ওরা উন্মাদ হিংস্র হয়ে উঠবে না বলুন! অথচ···

আমরা শিকারীর দল। আমাদের কাজই হচ্ছে সুযোগ বুঝে শিকার করা। তাই সুযোগ যখন এসেছে Shall I try one?

রণমলজী বলেন—না না···এখন থাক···ফেরার পথে দেখা যাবে।

সর্দারজী হেসে বলেন—হা—হা—হা···আপনি যে একেবারে দয়াময় হয়ে উঠলেন? কিন্তু এটা মনে রাখবেন ব্যবসায়ীদের দয়া মায়া এসব উপসর্গ থাকলে আর বনের জন্তু জানোয়ারের চামড়া দাঁত শিঙ এ সব বেচে পয়সা করা সুদূরপরাহত।

রণমলজী—সেই জন্যেই তো Diamond-এর সন্ধানে কঙ্গোর এই ভয়াবহ জঙ্গলে Life risk করে ছুটে চলেছি।

সর্দারজী প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন—কিন্তু রণমলজী, কঙ্গোর ভয়াবহ জঙ্গলে ঢুকলেই যে গুলি চালাতে হয় at random, নইলে শুধু ভ্রমণ করলে তো আর হীরা মিলবে না।

ছুরিগুলো কুমির দুটোর পেটদুটোকে চিরে ফালি ফালি করে দিল। [পৃষ্ঠা ৭৪৬

ওই অসভ্য পিগমীদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করে ওদের কাছ থেকে ও জিনিস কেড়ে নিতে হবে।

লড়ায়ের ফল যে কি দাঁড়াবে তা তো বলা যায় না।

হার কিংবা জিত।

জিততে গেলেই এই আগ্নেয় অস্ত্রটি অকরুণভাবে ব্যবহার করতে হবে। নইলে জানেন তো নররাক্ষস তারা···অমনি ছেড়ে দেবে না···

রণমলজী—লড়াই করে ওদের সঙ্গে পারবেন সর্দারজী?

সর্দারজী—প্রথম লড়াই···তারপর বুদ্ধির খেলা···!

কিবাকোরা ইতিমধ্যে জলে গা ঢাকা দিয়েছে···কেউ কেউ তীরে উঠে ঘাসে মুখ দিয়েছে।

পাশের শাখা নদীতে নৌকাগুলো ঢুকে পড়েছে।

তীরের পাহাড়ী উপলখণ্ডের বালুচরে কারা যেন হঠাৎ দামামা বাজিয়ে উৎসব শুরু করে দিল।

ভুলুয়া বলে—শেঠজী, বুশমেনরা জিরাফ শিকার করেছে। ওরা ওই তীরে ওঠে নাচছে। নৌকা বাঁধুন।

রণমলজী বলেন—দেখুন দেখি সর্দারজী, যাবার পথে কি সব বাধা। এই জন্যেই আমি আপনাকে কিবাকো মারতে বারণ করলাম···আর ভুলুয়াটা নিশ্চয়ই ওদের লেলিয়ে দিয়ে জিরাফ শিকার করে বসেছে?

সর্দারজী হো হো করে হেসে উঠে বলেন—ভবিষ্যতের আশায় ওরা উপস্থিতকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি···সামনের শিকার ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নে কোনো শিকারীই দিন গুনে না রণমলজী!

পেছনের নৌকায় মরা কুমির দুটোর ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছে বুশমেনরা। সেই ছাল দুখানা হাতে নিয়ে নীলাঞ্জীর সামনে ভুলুয়া নৌকার ওপর নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

নৌকাগুলো এসে তীরে ভিড়লো ধীরে ধীরে। সবাই ছোটে জিরাফের দিকে।

সর্দারজী নৌকা থেকে নামতে নামতে বলেন—জগতে সব রকম চামড়ার মধ্যে জিরাফের চামড়ার দাম সবচেয়ে বেশী সেটা নিশ্চয়ই জানেন রণমলজী!

রণমলজী বলেন—হুঁ!

পাশের অলক্ষ্য সঙ্গীরা এবার দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—"কাট্···অল্ ও-কে!"

(১৫)

ছটা বেজেছে।

আকাশে এক বিরাট সোনার থালা পাহাড়ী গাছের ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠেছে।

নদীর উপল প্রস্তর বেলায় আজ উৎসবের আয়োজন।

কিসের উৎসব? কি উৎসব? কারা এ উৎসবের মত্ত সঙ্গী সঙ্গিনীরা?

মৃত জিরাফের ছাল ছাড়ানো হয়ে গেছে। খালি সারা শরীরের মাংসপিণ্ডটা পড়ে আছে। তাকে ঘিরেই এ উৎসব রচনা···

দূরে এক পাহাড়ী গর্তে বনের শুকনো ডালপালা ফেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। লক-লক করে আগুনের শিখা বাতাসে দুলে দুলে উঠছে।

তারই ওপর দুপাশে দুখানা কাঠের কাঁচি খাড়া করে দিয়ে তার উপর লোহার রোলা রাখা।

বুশমেনের দল আর বয়ের দল তাণ্ডব নৃত্য করে সেই লোহার রোলা খুলে নিয়ে চললো।

কোথায়?

সেই ছাল ছাড়ানো জিরাফের মাংসপিণ্ডের কাছে।

সজোরে ঐ লোহার রোলাটাকে গুঁজে দিলে জিরাফের মাংস শরীরের এফোঁড় ওফোঁড় করে। তারপর···

দু দলে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সুরে সুরে হই-হল্লা করতে করতে চললো সেই আগুনের দিকে।

রোলাটাকে আবার মাংসপিণ্ডসুদ্ধ রেখে দিল কাঠের কাঁচির ফাঁকে। তারপর তাকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরাতে থাকে।

হঠাৎ কোথা থেকে নাচের তালে বাদ্যি বেজে উঠল।

টমটুম···টুংটাং···ছররা ছররা···

তার সঙ্গে দামামার আওয়াজের মত গাছের গুঁড়ির ঢোলক।

ক'খানা জঙ্গলের জংলী কাঠের টুকরো পাশাপাশি রেখে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা দিচ্ছে। তাতেই এক অনবদ্য সুর বেরুচ্ছে··· বেতের ঝুমঝুমি থেকে তারই তালে তালে বাজছে ছর্‌র—ছরর ছররা—ছর।

···থুতু লাগিয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরছে। [পৃষ্ঠা ৭৫০

অদ্ভুত বন্য ঐকতান।

দূরে নীলাঞ্জীর সারা অঙ্গটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। সে কাঁপন যেমন দ্রুত তেমনি ছান্দিক।

তার চারপাশ ঘিরে বুশমেনরা নাচের তালে পা ফেলে একবার করে এগিয়ে আসে আবার একপা করে পিছিয়ে যায়। মাঝে নীলাঞ্জী সারা বুক পিঠ হাতের পেশী নাচিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে রঙ্গ করছে।

অদূরে কাঠের বন্য টুলে রণমলজী, সর্দারজী, শেঠজী—সবাই বসে বসে সে নাচ দেখছেন।

অগ্নিকুণ্ডের ওপর জিরাফের শিক কাবাব বনবন করে ঘুরছে।

আর ভুলুয়া?

একটা পাথরের উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে এই সব মনোযোগ সহকারে দেখছে

আর ডানহাতের তর্জনীটা মুখের মধ্যে পুরে জবজবে থুতু লাগিয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরছে। রণমলজী তাকে দূর থেকে দেখে বলেন—ব্যাপার কি সর্দারজী, ভুলুয়া পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের আঙুলটা একবার করে মুখে পুরছে আবার তাকে বার করে আকাশের দিকে উঁচু করে আঙুলটা রেখে কি যেন দেখছে···কেন ?—জিরাফ পোড়া খাবার লোভ হয়েছে বুঝি ?

সর্দারজী—ওকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না ?

রণমলজী তাঁর আসন ছেড়ে উঠে ভুলুয়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সর্দারজী মৃদু মৃদু হাসছেন।

ভুলুয়ার কাছে রণমলজী বলেন—এই ভুলুয়া—এই উল্লুক—ডান হাতের ঐ আঙুলটায় থুতু লাগিয়ে অমন আকাশের দিকে তুলে ধরছিস কেন রে ? জিরাফ পোড়া খাবার লোভ হয়েছে বুঝি ?

ভুলুয়া নাচ দেখতে দেখতে বলে—পাহারা দিচ্ছি···

—পাহারা দিচ্ছিস তো হাতের আঙুলে থুতু দিচ্ছিস কেন ? আর কেনই বা আঙুলটা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে দাঁড়িয়ে আছিস ?

ভুলুয়া বলে—হাওয়া দেখছি।

রণমলজী—হাওয়া ? হাওয়া কিরে ?

ভুলুয়া রণমলজীর দিকে না চেয়ে বিজ্ঞের মত বলে—হ্যাঁ হাওয়া···হাতির হাওয়া··· পিগমীদের হাওয়া··· !

—হাতির হাওয়া পিগমীদের হাওয়া কি বলছিস ?

ভুলুয়া বলে—বলছি সব ঠিক ঠিক···করছি আমি তার চেয়েও ঠিক ঠিক। হাতির হাওয়া বুনোদের হাওয়া না নিলে যদি বুনোরা বা হাতির পাল ঝট করে এসে পৌঁছায়, তাহলেই সব উৎসব গেঁজিয়ে দেবে !

পেছনে এসে সর্দারজী দাঁড়িয়েছেন, মৃদু মৃদু হেসে বলেন—ঠিক করছে ভুলুয়া। ও হাওয়ার গতি দেখছে।

—সেটা আবার কি ?

—কি জানেন—আঙুলের থুতুতে আঙুলটা ভিজে গেছে। কাজেই ওতে হাওয়া এসে লাগলেই আঙুলের এক পাশ ঠাণ্ডা বোধ হবে। তাহলেই বোঝা যাবে—কোন্ দিক থেকে হাওয়া বইছে ?

—তবে যে ভুলুয়া বলছে হাতির হাওয়া···বুনোদের হাওয়া···

সর্দারজি বলেন—সেটাও ঠিক অর্থাৎ এখন যে হাওয়া বইছে তা যদি আমাদের দিক থেকে বয়ে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করে তবে হাতিরা বা বুনোরা আমাদের গায়ের

গন্ধ পাবে। তাহলেই তারা আমাদের সন্ধান পেয়ে এগিয়ে আসতে পারে ! কিন্তু হাওয়াটা যদি জঙ্গলের থেকে এদিকে বয়ে আসে, তাহলে ওদের গন্ধ বহন করেই আনবে সে হাওয়া—অবশ্য যদি তারা কাছাকাছি থাকে। ভুলুয়া সেই হাওয়ার গতি দেখছে, যাতে বিপদের আশঙ্কা না থাকে।

ভুলুয়া বলে—না হাওয়া জঙ্গলের দিক থেকেই আসছে। ভয় নেই, তাহলে আমি অনায়াসেই নীলাঞ্জীর সঙ্গে নাচতে পারি।

এক দৌড়ে ভুলুয়া ছুটে চলে উৎসব নাচের জলসায়।

জলসা তো নয়, এক অফুরন্ত বন্য উল্লাসের ঢেউ উঠেছে দিকে দিকে। জিরাফের শিককাবাবের চারপাশ ঘিরে বসেছে পুরুষদের জলসা-গান। একঘেয়ে বন্য গানের মাঝে মাঝে বিকট হুংকার।

মাঝের দল নীলাঞ্জীকে ঘিরে এগিয়ে পেছিয়ে উন্মাদ নৃত্য তুলেছে। নীলাঞ্জীর দুহাত ধরা দুটো জ্বলন্ত মশাল। তাই আকাশের দিকে ছুড়ে লোফালুফি করছে আর নাচছে।

ভুলুয়া আর বুশমেন সর্দার দুজনে ঝম্প-নাচের কসরতে মত্ত।

পাশের কিনারে কিনারে বুশমেনরা বনের লম্বা লম্বা গাছের ফাঁকা গুঁড়িগুলো গলায় ঝুলিয়েছে মাদলের মত করে। ফাঁকা গুঁড়ির দুধার চামড়ার ছাউনি। তাই মৃদঙ্গের মত বাজিয়ে যেন তাড়া করে আসছে···আর তাদের সামনে আর একদল হাতে বর্শা নিয়ে হাঁপাই ছুড়ছে।

সবারই উন্মত্ততা কিন্তু যেন একই ছন্দে বাঁধা।

ওদের হেঁড়ে গলার চিৎকার নীলাঞ্জীর সরু কণ্ঠের সুরোচ্ছ্বাস সবই যেন একসঙ্গে মিলে গিয়ে একটা হারমোনাইজড্ রাগ তরঙ্গ উঠেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রণমলজী সব দেখছেন আর বার বার সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করছেন···

—হঠাৎ এ উৎসব কেন ? কিসের উৎসব ? একি জিরাফ যজ্ঞ উৎসব ?

মাখন সিং জবাব দিচ্ছেন না, খালি মুচকে মুচকে হাসছেন ; একবার খালি মৃদু হেসে বলেন—অপেক্ষা করুন কিসের উৎসব পরে বোঝাপড়া হবে। হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে সর্দারজী বলে ওঠেন—ওই দেখুন জমিতে গোলাকারের মত সারকেল করে আগুন জ্বলে উঠেছে। দেখাচ্ছে যেন ঠিক আকাশের চাঁদের থালিখানা টেনে নামিয়ে এনে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে। চলুন চলুন···ওইদিকে যাই দেখি কী ঘটছে।

রণমলজীকে নিয়ে সর্দার মাখন সিং এগিয়ে চলেন। (ক্রমশঃ)

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাটিতে গোলাকৃত আগুন লকলক করে জ্বলে উঠেছে। মাঝের জমিতে হঠাৎ নীলাঞ্জী ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনের বেড় ভেদ করে। তারপর সে কি উন্মত্ত নৃত্য! নিজেকে যেন কার কাছে বিলিয়ে দিতে চায়··এমনি ভঙ্গীতে একবার করে চারপাশের আগুনকে আর আকাশের চাঁদকে জানাতে চায়।

চারদিকের নাচের হুল্লোড় এবার যেন শতগুণ বেড়ে উঠলো।

আগুনের গোলক পরিধির মাঝখানে নীলাঞ্জীর করুণ আবেদন সংগীতে উঠলো···যেন এক বুকফাটা আর্তনাদ।

সারা সংগীত-উল্লাস হঠাৎ থেমে গিয়ে নিশ্চুপ হয়েছে। আর তারই মধ্যে নীলাঞ্জীর এই হৃদয়বিদারক সুর যেন সারা বনানীর দরজায় দরজায় আক্ষেপে মাথা খুঁড়তে থাকে।

হঠাৎ আবার আগের উল্লাস যেন প্রকটিত হয়ে শতগুণ দ্রুত হয়ে উঠলো। নীলাঞ্জী অগ্নি-পরিধি থেকে এক লাফে আগুন ভেদ করে বেরিয়ে এলো···

সামনেই বুশমেনদের হাতে হাতে ধরা প্রকাণ্ড অগ্নিবালা সারি সারি রক্ষিত। নীলাঞ্জী সেই সমস্ত অগ্নিবালা একে একে অতিক্রম করে, ছিটকে এসে পড়ে এক অনুচ্চ পাথরের চত্বরে···

সমস্ত সংগীত থেমে যায়।

দলের বুশমেন থেকে বয় কাফ্রিরা পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে বসে যেন কাকে প্রণাম জানায়।

নীলাঞ্জীও সেই পাথর চত্বরে নাচের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নিবেদন করে কোন অজানিত বাঞ্ছিতের কাছে।

সামনেই সোনার থালার মত চাঁদ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আকাশে।

সারা জঙ্গলভূমি নীরব নিস্তব্ধতায় শান্ত। তার মাঝে হঠাৎ শোনা যায় সর্দারজীর ভারী কণ্ঠ। বলছেন—রণমলজী, এ উৎসব রচনা করেছে বুশমেনরা চাঁদের পূজায়,···এরা যে সব চাঁদের পূজারী! তাই এ উৎসবকে "চন্দ্র মহোৎসব" নাম দিতে পারেন।

অলক্ষ্যের দর্শকদের তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এলো।

Wonderful···Fade out···all O. K. Pack up for the day···our days works are done···অর্থাৎ

অদ্ভুত!···এইখানে সিন শেষ হলো···সমস্তই সুন্দর উঠেছে···আজ তবে তলপি তোলা যাক। আমাদের দিনের কাজ সমাপ্ত।

নীলাঞ্জীও নাচের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে নিবেদন করে··· [পৃষ্ঠা ৮১৬

ঘড়িতে তখনও সাতটা বাজেনি।

আকাশের মাঝে পূর্ণচন্দ্রের পাশে সূর্য ঢলে পড়ছে। তবু অফুরন্ত দিনের আলো।

বিষুবরেখার এইটুকুই বিশেষত্ব। আর, চন্দ্র-তপনের মিলন-বাসরঘর হচ্ছে রিয়ানঞ্জারো রেঞ্জের চাঁদের পাহাড়।

সে রাত্রে আর "ব্যাকজারনী" করা হোলো না।

পাহাড় নদীর মধ্যস্থ এই উপলখণ্ড বিছানো ছোট্ট উপত্যকাতেই রাত্রিবাসের আয়োজন করা হোলো।

আমাদের সারি সারি টেন্ট পড়েছে।

সুটিংএর দৌলতে দেশীদের ভাগ্যে আজ মহোৎসব।

জিরাফের মাংসই আজ ওদের উপাদেয় আহার্য, ওতেই হবে ওদের ভোজপর্বের সমাধা।

অবশ্য আমাদের চলবে না। তবে,···

ব্যানার্জি বলছিল—অকসটাং খেয়ে দেখেছি, খুব সুস্বাদ। এবার জিরাফের মাংসটা টেস্ট করে দেখলে কি হয় ?

আমি হেসে বলি—দেখুন না···আপনার তো সংস্কারের বালাই নেই।

মিত্তির আর সুধীর এসে আমাদের টেণ্টে ঢুকলো।

আমি বলি—কি হে মিত্তির !···তুমি আর সুধীর দুই বন্ধুতে সেদিন তো অক্সটাং নিয়ে হাতাহাতি করতে বাকী রেখেছিলে, আজ দুজনে মিলে জিরাফের মাংসটা একটু চেখে ছাখো না ? অঢেল আছে, আজ আর কারও কোনো ভাগে কম পড়বে না। ব্যানার্জি সাহেব তো বলছেন টেস্ট করবেন, কাজেই ব্রাহ্মণেভ্য নমো বলে দাও না সাফ করে···ইতিহাস রচনা হবে জীবনে।

মিত্তির হাসতে লাগলো।

বললো—ওকথা থাক। বলুন আজকের শট্‌গুলো কেমন হোলো ?

বললাম—Performanceএর দিক থেকে Wonderful হয়েছে। তবে সবটাই হচ্ছে তোমার বন্ধুবর শ্রীসুধীরের হাতে, কি বলো সুধীর ?

সুধীর বলে—আমার দিক থেকে কোন কিছুর গণ্ডগোল হবে বলে মনে হয় না। তবে জানি না, আপনার সাউণ্ড ডিপার্টমেণ্ট কতদূর কি করেছে ?

বলি,—জগতাপ আমায় রিপোর্ট পেশ করে গ্যাছে।

মিত্তির জিজ্ঞাসা করে—কি রকম হয়েছে বললে ?

ও বললে, মিউজিক, ড্রাম, গানের মাঝে ঘন ঘন হঠাৎ চিৎকার, সব কটা মিলে একটু jumbled up হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ট্র্যাক লাইন পরিষ্কার পাওয়া যাবে।

আমি বললাম—তাতেই আমার হবে। Post Synchronisation করে নিলেই হবে।

সর্দারজী এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—

'পোস্ট সিন্‌ক্রোনাইজেশন' ব্যাপারটা কি ? কাল থেকে তো কথাটা অনেকবার শুনলাম।

আমি বলি—কি জানেন, শব্দের ট্র্যাক লাইন ভালো করে পেলে···নতুন সংগীত, নতুন করে ডায়লগ তুলে সেই ট্র্যাক লাইনের ব্যবধান ধরে এডিটিংএর সময় Replace করে নেওয়া চলে। তা বলে সংগীত বা ডায়লগগুলো যা সুটিংএর সময় বলা হয়েছে, ঠিক সেইগুলি ঠিক ঠিক সময়াক্ষেপে স্টুডিওতে বলিয়ে নিতে হয়।

মিত্তির বললে—নীলাঞ্জীর নাচটা ছবির একটা সম্পদ হয়ে থাকা উচিত।

আমি বলি—সত্যই ওটা একটা সম্পদ, কারণ যতই ট্রেনিং দিয়ে আর্টিস্টকে এ নাচ

শেখানো হোক না কেন নীলাঞ্জীর স্বভাবসুলভ সারল্য আর সাবলীল গতিভঙ্গীর কাছে দাঁড়াতে পারতো না।

এ হয়েছে একেবারে ন্যাচারাল কি বলেন ?—মিঃ মিত্তির বলে ওঠে।

আমি বলি—ন্যাচারাল হোলেই যে অনবদ্য আর্ট হবে তার মানে নেই। বলা যেতে পারে, এ নাচটা নীলাঞ্জীর নাচের একটা Actual Occurrence, এটা তার Performance নয়।

একটু বোঝবার চেষ্টা করে মিত্তির আর সুধীর টেণ্ট ত্যাগ করলো। আমি চেঁচিয়ে বলি—কি হে, তোমরা জিরাফের মাংস খাচ্ছো তো ? খেয়ে ফেলো—খেয়ে ফেলো। কথায় বলে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

সর্দারজী হেসে বলেন—জিরাফের মাংস নিয়ে ঠাট্টা করছেন মিঃ বোস, তবে কি জানেন, সব মাংসেরই টেস্ট প্রায় একই ধরনের। তবে কেউ একটু নরম, কেউ একটু চোঁচুলা অর্থাৎ শক্ত !

পৃথিবীতে শুনেছি মানুষের মাংসই সব চেয়ে সুস্বাদু। জানি না, তবে যতদূর এক্‌স্‌পিরিয়েন্স আছে তাতে উট জিরাফ ঘোড়ার মাংস একই ক্যাটাগরিতে পড়ে।

আমি বলি—আপনি জিরাফের মাংস কখনও খেয়েছেন নাকি ?

উনি বলেন—খেয়েছি তো বটেই···আজ রাত্রেও খাবো ! ওটা আমার ভালই লাগে।

আমি চুপ করে থাকি। আমার অভিজ্ঞতায় ছাগল-ভেড়ার মাংস বা বড়জোর দু'চার রকম পাখীর মাংস পর্যন্ত···স্বাদ বিস্বাদের কথা ওঠে···তাও অতি সন্তর্পণে অনন্যোপায় হয়ে খাই। তাই আমার কাছে এই অবিচার আহার্যের স্বাদ আস্বাদ সম্বন্ধে মতামত খানিকটা গ্রীক ভাষারই সমতুল।

* * * *

সর্দারজী হয়ত বুঝতে পেরেছেন···জঙ্গলে হলেও আমি এসব রসের রসিক নই। তাই একটু চুপ করে থেকে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—ওদের চন্দ্র মহোৎসব কেমন লাগলো ?

আমি বলি, খুবই ভালো লেগেছে সর্দারজী, এ এক আমার নতুন অভিজ্ঞতা। বন্য জংলীদের উৎসব অনেক রকম দেখেছি···এরকমটা আর কখনও দেখিনি। জঙ্গলের বীভৎসতা নেই আমাদের দেশের জংলীদের উৎসবে। তারা সব মহুয়ার মদ খেয়ে ভোম্ হয়ে নাচে, গান করে, তীর ধনুকের খেলা দেখায়···মেয়েরা নানান রকম নাচের কসরতি দেখায় ; কিন্তু নীলাঞ্জীর মত অঙ্গের প্রতি মাংশপেশী চালনার ক্ষমতা ভারতের কোনো আদিম জাতই পারে বলে মনে হয় না।

আমি অবশ্য সাঁওতালদের নাচই প্রধানতঃ দেখেছি। দেখেছি ঘাটশীলার অনতিদূরে সোনাগড়ার পাহাড়ী এলাকায় সাঁওতালদের উৎসব।

প্রায়শঃ লক্ষ সাঁওতাল আর সাঁওতালনি এসে মিলিত হয় এই মেলায়। তাদের সঙ্গে

এক একটা জয়ঢাক থাকে যার ভেতরের ঘের (Diameter) বোধ হয় ৭।৮ ফুটের ওপর হবে। একেবারে লোমযুক্ত কাঁচা চামড়ার বাঁধাই···পিটে পিটে তার মাঝখানের লোম উঠে গেছে···বাকী পাশগুলো এখনও লোমশ রয়েছে।

এদের শিকার নাচ···শত্রু বিজয় নাচ···মেয়েদের মনের মানুষ ভোলানো নাচ···এমনিতর কত রকমের নাচই না দেখেছি; কিন্তু শিল্পজ্ঞানে আফ্রিকার অধিবাসীদের, বিশেষ করে মেয়েরা ওদের হার মানিয়ে দিয়েছে। এ দেশ ঘুরে দেখছি···প্রতি পঞ্চাশ মাইল অন্তর নতুন নতুন জাত। তাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্মানুষ্ঠান, নাচ গান উৎসব সবই যেন একের থেকে অপরের বিভিন্ন; কিন্তু প্রত্যেকের নাচের মধ্যে কলাকুশল যেন অতি সূক্ষ্ম··· সেটা বন্য অধিবাসীদের মধ্যে কেমন করে এসেছে আমি ভেবে পাই না।

ধরুন এই বুশমেনদের চন্দ্রমহোৎসবটা। এটার the very ideaটি কেমন Romantic.

আমাদের সভ্য মানুষের মধ্যে···বিশেষ করে ভারতীয়দের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের তিথি ধরে কত কতই না উৎসব করি, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের রামলীলা···কি ঝুলন উৎসব বা দোললীলা···সেখানেও পূর্ব যুগ থেকে নাচ গান মনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়ে আসছে। আবার দেহাতী সভ্যেরা রচনা করে এমনি চাঁদকে ঘিরে তাদের সংগীত আসর যেমন বিহারের চৈতী কাজ্‌রী—এতেও নাচ রয়েছে, ঝুলায় ঝুলায় দোল খেয়ে কত রঙ্গ কত ব্যঙ্গ গানে গানে জমিয়ে তোলে···কখন বরষার সঙ্গে ময়ূর ময়ূরীর মত সবাই মিলে পেখম তুলে নাচতে শুরু করে; কিন্তু দেহের সঙ্গে এমন নাচনের ঢেউতরঙ্গ তুলতে কখনও দেখিনি।

চোখের ইশারা আছে···হাতের মুদ্রা আছে···কিন্তু প্রতি মাংসপেশীর এমন দর্শনীয় আবাহন আমাদের কোনো চন্দ্রোৎসবে দেখিনি।

আরও একটা জিনিস বড় ভাল লাগলো—সেটা এদের চন্দ্রদেবতার পূজা। আমাদের দেশে চন্দ্রকে আকাশে রেখেই তার চন্দ্রকিরণ অমিয়ে স্নান করে, অবগাহন করে নিজেদেরই মধ্যে নাচ-গান-সংগীত আসরে মেতে ওঠে; কিন্তু এদের মাতন চন্দ্রকেই কেন্দ্র করে···তাকে আহ্বান জানিয়ে মনের কাতর উক্তিতে তার কাছে নিজের অন্তরের পূজা পাঠিয়ে দেবার দুরন্ত প্রয়াসটুকুতেই।

রণমলভাই এখনও পর্যন্ত আমাদের আসরে অনুপস্থিত। তাই সর্দারজী বল্লেন—রণমল-ভাই-এর কী হলো···এখনও পর্যন্ত ফিরে এলেন না তো?

আমি বলি—তিনি তো কালকের আয়োজনে সুটিং শেষ হতেই বুশমেন সর্দারকে নিয়ে নৌকা করে বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে দেরি হচ্ছে কোনো বিপদ-টিপদ হোলো না তো!

সর্দারজী বলেন—নেহি···নেহি, বিপদ হবে কেন···তবে তাঁর অনুপস্থিতিটা কেমন যেন লাগছে।

রণমলভ ই এসে উপস্থিত হয়ে গেলেন।

আমি বলি—এই সর্দারজী আপনার কথাই বলছিলেন···বাঁচবেন অনেক দিন।

তিনি হেসে বলেন—দেখি কাল থেকে দেশের পথে পা বাড়াচ্ছি—এই যাত্রায় বেঁচে ফিরলে তবেই না অনেক দিনের কথা।

আমি বলি—আজকের যুগেও কি এমনিতর ভয় রয়েছে জঙ্গলে?

জঙ্গলে ভয় চিরদিনই থাকবে। জংলীদের গায়ে আজকের জাগরণের হাওয়া এসে কোনদিনই লাগবে না—কাজেই তারাও চিরদিন এমনি ভয়ালই থেকে যাবে মিঃ বোস। কাজেই ভয় নেই বল্লে মিথ্যা বলা হবে।

সর্দারজী মৃদু হেসে বলেন—খত্‌র্‌···একটু থাকবে বইকি জঙ্গলে, তাইতো এ পথের পথিকদের যাত্রাকে বলা হয় Adventure. জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার আদমখোরদের হাতে মৃত্যু হলেও তাই বলা হয় Romantic মৃত্যু। আর জয়ী হয়ে ফিরে এলেও সবাই বলেন—হিরো।

তারপর হা-হা করে হেসে উঠে বলেন—এ আপনাদের ছবির হিরোর থেকে ঢের বেশী ইজ্জতের।

আমি বলি—রণমলজি আমাদের ছবিরও হিরো আর জঙ্গলেরও হিরো। কি বলেন রণমলভাই?

সবাই হেসে উঠি।

এমন সময় খাবার জন্যে ডাক এলো।

রণমলভাই আর আমি নিরামিষাশী···তাই ওদের ভোজসভায় উপস্থিত হলাম না।

রণমলভাই বললেন—খুব বড় একটা আনানেস এনেছি···আর কেল, অ্যাভাগোটা পিয়ার আছে···টিনমিল্ক দিয়ে আসুন খেয়েনি। এতে যদি না পেট ভরে তাহলে দুখানা রোট্‌লি আচার দিয়ে খেলে হবে।

সত্যি অত বড় আনারস আমার জীবনে আমি কখনও দেখিনি, যেমন মিষ্টি তেমনি রসাল। মাঝের বুকোটা পর্যন্ত নেই, সবটাই যেন রসে টইটম্বুর।

কলার সাইজ এক হাত পরিমাণ লম্বা···মাখনের মত নরম···স্বাদে অপূর্ব। রোট্‌লি অর্থাৎ রুটি (পাতলা পাতলা রুটিকে গুজরাটীরা রোট্‌লি বলে)···অ্যাভাগোটা পিয়ার আর দুধের ক্ষীরে ডুবিয়ে সে রাত্রের আহার শেষ করলাম।

(১৭)

ভোর চারটায় নৌকা ছাড়া হোলো।

তখনও পশ্চিম আকাশে গতরাত্রির পূর্ণচন্দ্র আকাশের শেষ সীমানায় দেখা যাচ্ছে। তার অনাবিল জ্যোৎস্নাধারায় আমাদের সামনেই মাউন্ট অফ দি মুনের হিমাঙ্গগুলিকে যেন সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সে আলো বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে হীরের মত ঝলমল করছে।

পাশের বনে বনে সে চন্দ্রকিরণের রেশ এসে বনস্পতির পাতাগুলোকে যেন রূপালী সজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছে।

পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের সময় এসে পড়েছে, তাই পূর্বদিকচক্রবালে লালের আভার ছিটে।

নৌকার গতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাচলের অন্ধকার যেন অবগুণ্ঠন খুলে চোখ মেলবার চেষ্টা করছে। নববধূর প্রথম সলজ্জ রক্তিম চাহনির মত, ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে। সেই অনির্বচনীয় রঙে আমাদের মনেও প্রতিক্ষণে ইন্দ্রধনু খেলে যাচ্ছে।

আমরা তীরবেগে এগিয়ে চলেছি আজের খেলা আজই সাঙ্গ করে প্রাক্‌সন্ধ্যায় ক্যাম্পে ফিরতে হবে।···

ভোরের হাওয়ায় মাঝিমাল্লাদের একটানা জংলী সুর যেন এক অসীম উদ্দামতার দিকে চেয়ে ভবিষ্যতের পথ মাপছে।

দাঁড়ের শব্দে নদীর থেকে হুস্ হুস্ করে মাথা তুলে ধরছে কিবাকোর দল। তীরের দিকে প্রথম আলো এসে পড়ছে···সে আলোয় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—দুই তীরের স্বল্পপরিসর উপলবেলায় সারি সারি জঙ্গলের কাটা গাছের লগ পড়ে থাকার ওপর। যেন সেই "লগ"গুলো কারা অবিন্যস্ত অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছে।

হঠাৎ মাখন সিংএর বন্দুকের মুখ থেকে পর পর অগ্নিস্ফুরণ হতে লাগলো। সে আওয়াজে বনস্থলী রণিত ঝনিত হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তীরের লগগুলো যেন জীবন্ত হয়ে সরসর করে জলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

—ওরে বাপরে!···ওগুলো সবই জ্যান্ত ম্যানইটার কুমীর···এতো কুমীর!

জলে ডাঙ্গায় সব জায়গায় যেন কারা এদের এনে জড়ো করে রেখেছে এই জলেস্থলে।

ঝপঝপ করে দুপাশ থেকে পরপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাশি রাশি ঘড়িয়াল।

জল স্বচ্ছ···তাই নীচে পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তার দিকে নজর দিয়েও দেখি, তার মধ্যে রেপটাইল হাউসের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে কুমীর আর কিবাকোর দল।

বলি—এ নদীতে নৌকা এগুবে কি করে?

নৌকা কিন্তু এগিয়ে চলে ওদের নীচের তলায় ফেলে। সারা নবাগতের দল এ দৃশ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। পাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সর্দার মাখন সিং আর রণমলভাই পরস্পরে চাওয়াচাওয়ি করে মৃদু মৃদু হাসছেন।

নৌকাগুলো নদী ছেড়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লো ছিলে-পড়া একটা শাখা নদীর জলস্রোতে।

এ স্রোতের টান খুব। তাই নৌকার গতি কেমন ধাক্কা খেয়ে কমে এলো। কিন্তু, সুখের বিষয় এই নদীতে অমন বোঝাই করা কুমীর পোষা নেই। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এই নদীর জলস্রোত ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ী এলাকার উঁচুতে যে উঠছি তা বোঝা গেল। প্রায় বারজন বয় আর মাঝি নৌকা তীরে দাঁড় করিয়ে তীরে নেমে গেল। দেখলাম তারা তীর দিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নৌকাগুলোকে গুণ টেনে এগিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকাগুলো এসে থামলো একটি কিনারায়।

আমাদের সর্দারজীর order হোলো সবাইকে নামতে।

তীরের এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে বড় বড় বনস্পতি মাথা উঁচু করে আকাশপানে চেয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই মধ্যে মধ্যে সূর্যকিরণ পৌঁছে বনস্থলীকে আলোছায়ায় চিত্রিত করেছে।

সর্দারজী follow করে পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে চলেন।

নীলাঞ্জীকে একহাতে দোধারী বর্শা অপর হাতে রেশমী দড়ি নিয়ে সেই বনস্থলীর মধ্যে ঢুকে যেতে দেখলাম।

সর্দারজী তাকে যেন follow করে পিছনে পিছনে দ্রুত এগিয়ে চলেন। অতএব সারা দলটি তাঁকে অনুগমন করে।

* * *

গহন অরণ্যের ঝরাপাতার ওপর মচমচ আওয়াজ করে সবাই চলেছি সর্দারজীকে অনুসরণ করে। এগিয়ে পড়েছেন সর্দারজি, রণমলজি আর নীলাঞ্জী।

তাদের পেছনে ভুলুয়া, শেঠজী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা অভিযানের ছন্দে মার্চ করে চলেছেন···

হঠাৎ জঙ্গলের অপরদিক থেকে প্রতিধ্বনির মত নীলাঞ্জীর চিৎকার ভেসে এলো···বানাবুকা হুঁশিয়ার···

(ক্রমশঃ)

বিশ্বরেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]
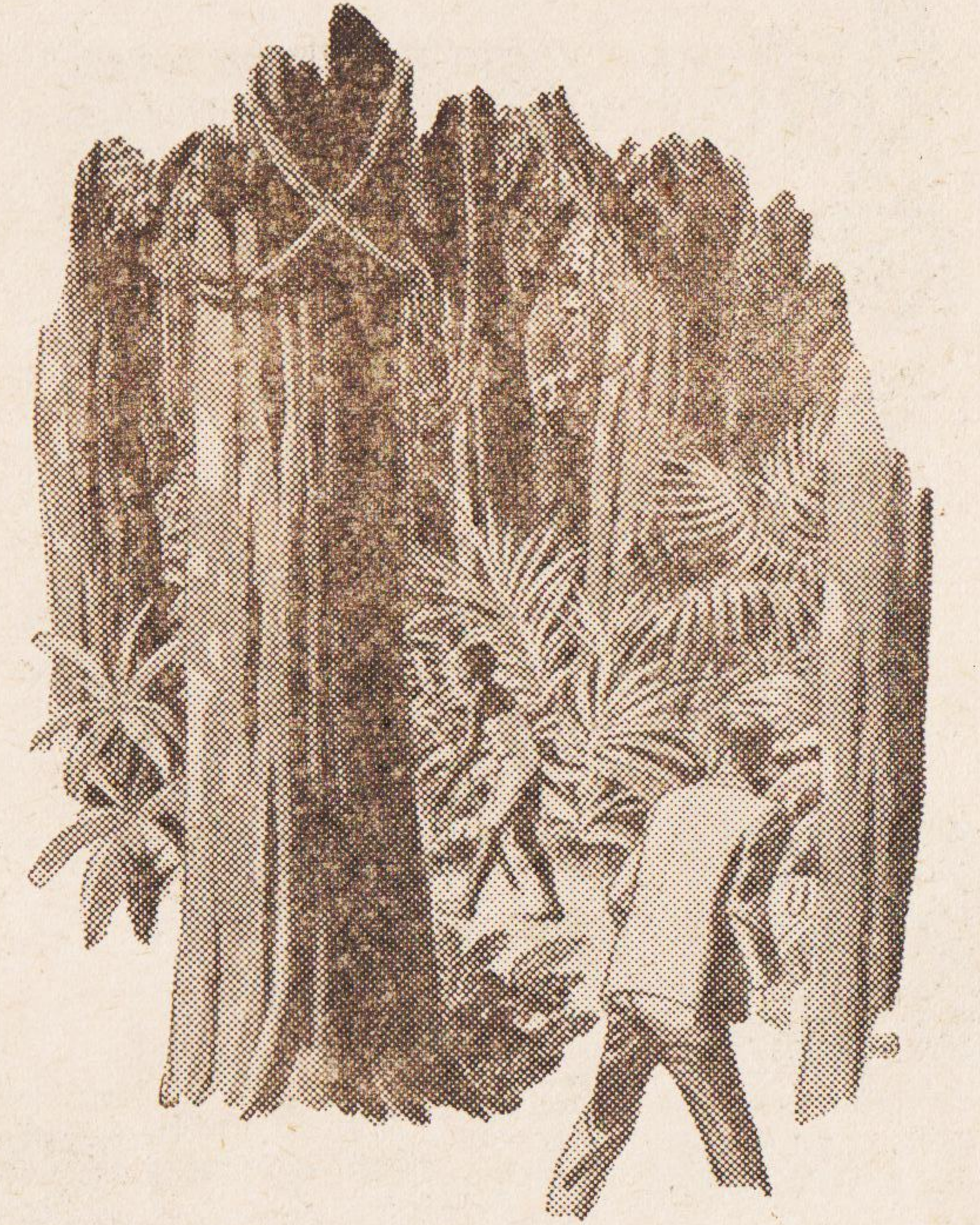
অদূরেই রণমলজী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে…পাশে তার সর্দারজী।

রণমলজী নীচুস্বরে বলেন—ঐ…ঐ যে ওখানে নীলাঞ্জী। এদিক দিয়ে আসুন সর্দারজি!

লতাগুল্মের আস্তরণের জালখানা ঠেলে ফেলে রণমলজির সঙ্গে সর্দারজী এগিয়ে চলেন।

রণমলজী নীলাঞ্জীর গতিবিধি কেমন এক অদ্ভুত অপ্রকৃতিস্থ রকমের দেখেন… বলে ওঠেন—নীলাঞ্জী কি যেন শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে বলুন তো?

সর্দার মাখন সিং নিমেষে নীলাঞ্জীর গতিবিধি বুঝে ফেলে উত্তর দেন—তাই নাকি, শুঁকে বেড়াচ্ছে? তবে নিশ্চয়ই নীলাঞ্জী কোন হিংস্র জানোয়ারের গন্ধ পেয়েছে। জানোয়ারদের সঙ্গে বসতি করে করে ওর সমস্ত instinct জানোয়ারদের মত সজাগ হয়ে গেছে।

রণমলজি বলেন—এ অভেদ্য জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার?

সর্দারজি বলেন—এধারের জঙ্গল বরাবর অ্যালবার্ট পার্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এই সব জঙ্গলে পাওয়া যায় না এমন জন্তু জানোয়ার…

কথা কে-ট হিস্ আওয়াজ তুলে রণমলজি, চুপিচুপি বলে ওঠেন—শুঁকতে শুঁকতে নীলাঞ্জীর মুখখানা কী রকম হয়ে যাচ্ছে দেখুন…যেন মনে হচ্ছে ও ভয় পেয়েছে।

—হয়তো আমাদের নিকটেই কোন ভয়ংকর জন্তু গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হিস—হি—স-স-স, একটানা আওয়াজ করে নীলাঞ্জী পিছু হটতে হটতে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সর্দারজীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে—বানাকুরা বাগো—

সর্দারজী বলেন—কা-রে…কা…

নীলাঞ্জী অমনিতর ফিসফিস করেই বলে,—আদমখোর—

আদমখোর কথাটা রণমলজীর কানে পৌঁছতেই হঠাৎ যেন এক ভয়ার্ত চিৎকার রণমলজীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে—আ—দ—ম—খো—র?

সর্দারজী আস্তে আস্তে জবাব দেন—জী! যারা দয়া করে আমাদের মাংস খায়, নীলাঞ্জী সেই রাক্ষসদের গন্ধই বাতাসের মাধ্যমে পেয়েছে।

রণমলজী বলেন—নিশ্চয়ই পিগমীদের গায়ের গন্ধ!

সর্দারজী বলেন—অসম্ভব নয়, তবে…

রণমলজী বলেন—তবে?

সর্দারজী নীলাঞ্জীকে জিজ্ঞেস করেন—কুবাটু…মিমি…বাসা…

নীলাঞ্জী প্রকাণ্ড একটা গাছের পাশে একটা অ্যালিফ্যান্ট গ্রামঘেরা একটু খোলা মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ইয়ে বায়ু—বানকুবা!

রণমলজী কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে আগে পিছে দেখতে থাকেন।

সর্দারজী বলেন—আসুন রণমলজী—আমাদের এই পথে যেতে বলছে নীলাঞ্জী… Quick—Quick…

নীলাঞ্জী সর্দারজীকে আবার হিস্ শব্দে ইশারা করে বলে—সাচ্চো মিমি—বাসা…ইন বাটু…ওসি তিসি বাসা…উন বাটু…

সর্দারজী বলেন—রণমলজী আপনি ঐ পথে একাই এগিয়ে যান…কিন্তু দেখবেন! খুব সাবধান…আমায় নীলাঞ্জী তার সঙ্গে যেতে বলছে।

নিমেষে দুজন দুদিকে বন্দুক হাতে এগিয়ে যায় আভ্যন্তরীণ জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমিতে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

রণমলজী পিছুতে পিছুতে বন্দুক ঘুরিয়ে সারা দিক লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন। চারপাশে তাঁর চোখের তারা ঘুরছে। প্রতি পাদক্ষেপে দুর্ধর্ষ বিপদের শঙ্কায় একপা একপা করে উন্মুক্ত মাঠের দিকে পিছু ফিরেই হটতে থাকেন। পদে পদে বড় জংলী ঘাসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরছে।

হঠাৎ পিছুতে গিয়ে কিসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে ওঠেন—কে?

পিছনে দাঁড়িয়ে ভুলুয়া হাসছে।

বলে—আরে আমিও হাওয়ার গতি দেখতে দেখতে পিছু হটছিলাম শেঠজী—ধাক্কা লাগিয়ে গেলো।

রণমলজী দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠেন—বেল্লিক… উল্লুক……নীলাঞ্জী আদমখোরের সন্ধান পেয়েছে আর উনি এখানে দাঁড়িয়ে হাওয়ার গতি দেখছেন?

ভুলুয়া রণমলজীর গালাগালটা বেমালুম হজম করে নিয়ে মাটিতে শুকনো ঘাস ছিঁড়ে ওপরের হাওয়ার বুকে ছেড়ে দিয়ে বলছে—দেখিয়ে… হাওয়া উল্টা বইছে। ঘাসগুলো উড়ে চলেছে আমাদের দিক থেকে অপর-দিকে…মাইনে কি? না, হাওয়া হাতীর পাশে চলিয়ে যাচ্ছে হামাদের গন্ধ নিয়ে…

রণমলজী বলেন—এ জঙ্গলে আবার হাতী কোথায় পেলি হতভাগা?

নীলাঞ্জী খোলা মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে… [পৃষ্ঠা ৮৯০

ভুলুয়া রণমলজীর হাতখানি টেনে নিয়ে ফাঁকা চৌকা ঘাসওয়ালা জমিটার দিকে চলে। যেটাকে আগে সর্দারজী মাঠ বলেছিলেন।

রণমলজি ছাখেন—প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি বুনো হাতী একসঙ্গে ওর অপর পাশে দাঁড়িয়ে। নিজেদের নিয়ে খেলা করছে।

কি সর্বনাশ! একদিকে এই হাতীর পাল…অপরদিকে নরখাদক আদমখোরের গন্ধ।

রণমলজি বলেন—Hush…বুনো হাতীর দল আমাদের হাওয়া পেলেই Attack করতে পারে তো! তাহলে…

ভুলুয়া বলে—তাতো করবেই। এখন একটাই বাঁচার উপায় আছে…ওদের পাশ কাটিয়ে অপরদিকের জঙ্গলে পোঁছে যান। ব্যস…হাওয়া হামাদের গন্ধ নিয়ে আর হাতীদের কাছে পোঁছে দেবে না…বরং হামারা হাতীদের পিছে পড়ে যাবো।…

* * *

ওদিকে নীলাঞ্জীর সঙ্গে সর্দার মাখন সিং পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন। নদীর কিনার আর প্রায় দশগজ!

নদী বলতে আগের নদী···যে নদীতে ভরা ছিল কুমীর আর কিবাকোতে।
হঠাৎ নীলাঞ্জী বলে—খামোশ—বানকুবা···

সর্দারজী থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন···হাতের বন্দুক নিশানায় তুলে নিলেন।

নীলাঞ্জী চুপি চুপি বলে—আহেস্তে চুপ চুপ···নদী কিনারে—বানাকুবা···মিমি···মগর মান্নু···তিম্মি···বলদেব—লাসা—

তাড়াতাড়ি পথটুকু কোনোরকমে পার হয়ে নদীর কিনারে এসে ওরা দুজন পৌঁছায়।

নদীর বালুবেলায় কুমীর পড়েছিল তাকে লক্ষ্য করে সর্দারজী বন্দুক ছুড়লেন উপর্যুপরি তিনটা।

গুলিবিদ্ধ মগরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রেশমী রশিতে বাঁধা দুধারী বর্শাটা, নীলাঞ্জী সেই আহত কুমীরটার মাথায় নিমেষে গেঁথে দিলে।

হাতের রশির বাড় দিলো ছেড়ে। কুমীরের ঝাঁপাই ছোড়ার সাথে সাথে রশির বাড় টেনে নিয়ে কুমীর জলে ডুব সাঁতার মেরেছে। নীলাঞ্জী চিৎকার করে বলে ওঠে—বানাকুবা বরছা—রশ্মি···ইনিমাকু···(অর্থাৎ বর্শার মুখে যে দড়িটা গলানো আছে···রশি দিয়ে মাছ ধরার মত আদি জংলীরা বর্শার ফালার ভেতর গর্ত করে তাতে রেশমী দড়ি পরিয়ে দিয়ে কুমীর জাতীয় বড় জলজন্তুর মাথায় মুখের ওপর ছুড়ে বিঁধিয়ে দেয়। তাতে বর্শার ফলাটা গিয়ে ওখানে আটকে ধরে। ফলে রশি ছেড়ে শিকার বেরিয়ে যেতে পারে না। তারপর খেলিয়ে খেলিয়ে তাকে ধীরে ধীরে ডাঙায় তুলতে হয়। হিংস্র জন্তুকে প্রথমে গুলির আঘাতে অর্ধেক জখম করে, পরে বর্শাবিদ্ধ করা হয় এবং তাকে জলের মধ্যেই বেঁধে রেখে দিয়ে যাওয়া হয়। তাতে প্রথম সে ক্ষিপ্ত হয়ে লম্ফঝম্প করে, পরে দুদিন গেলে সে নিস্তেজ হয়ে আসে)

রশি ধরে টেনে বাঁধে নীলাঞ্জী আর সর্দারজী গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। নীলাঞ্জী বলে—খিঁচ্চো···সব···লেটে···সোক্কা···

সর্দারজী বলেন—কু বাট্টু আদমখোর ?

নীলাঞ্জী বলে—লেটে লাইয়া···পিম্মি কিনার···

নদীর কিনার ধরে দুজনেই এগিয়ে চলে নদীর নীচের দিকে।

এক নিমেষেই পাথরের এক চোরা পথে ওরা দুজনেই এসে পড়ে অপর নদীর সীমানায়। তারই অনতিদূরে রণমলজী নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে ভুলুয়াকে বলছেন—হাঁ করে কি দেখছিস···জলে নেমে পড়।

ভুলুয়া সেকথার জবাব দেয় না।

পিছনদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একবার একটু ফিক করে হেসে বলে—ব্যস্‌জি—নীলাঞ্জী আগেয়া···আরে নীলাঞ্জী···আরে সর্দারজী···

নদীর স্রোতে ভুলুয়া পা রাখবার চেষ্টা করছে। বললে—নদীতে জল মাপতে চলেছি, উসপার যাবো···

সর্দারজী কিছু বলার আগেই নীলাঞ্জী আবার জঙ্গলের ধারে ধারে শুঁকে শুঁকে বেড়ায়।

রণমলজী বলেন—ওখানে একপাল হাতী দাঁড়িয়ে আছে, তাই নদী পার হয়ে ওপারে যাচ্ছিলাম···তাতে করে যাওয়ার গতি বদলে যাবে।

নীলাঞ্জী বলে—বানাকুবা মোট্টা···মোট্টা···বিবিওয়াম্বা···

সর্দারজী বলেন—হ্যাঁ রণমলজীও তাই বলছেন···কিন্তু নদী পার হতে রাজী নই··অন্য উপায় খুঁজতে হবে।

তারপরে ভুলুয়াকে বলেন, আমাদের নৌকাগুলো কত দূরে ?

—বহুদূরে সর্দারজী।

কথাবার্তার মাঝেই কখন যে নীলাঞ্জী হঠাৎ সাতরে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গ্যাছে···কেউ জানতে পারেনি।

নীলাঞ্জী বলে—মি···মোট্টা···বিবিওয়াম্বা···লেটে···

নীলাঞ্জীর কথায় সর্দারজী সামনের দিকে এগিয়ে চলেন—রণমলজি আর ভুলুয়া তাকে অনুসরণ করেন।

অদূরেই হাতীর পাল।

বাচ্চা হাতীরা শুঁড়ে করে ধুলো ওড়াচ্ছে।

একটা বাচ্চা হাতী সে তার মায়ের বুকের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দুধ খাচ্ছে আর ছোট্ট শুঁড়টি তার মায়ের পেটে আছড়াচ্ছে···

(হাতীরা শুঁড় দিয়ে মায়ের দুধ খায় না···তারা তাদের নীচের ঝোলা চোয়াল আর শুঁড়ের নীচের মাংসল জায়গাটা দিয়ে চাপ দিয়ে দুধ চুষে খায় আর শুঁড়টা হেলিয়ে হেলিয়ে খেলা করে···)

ভুলুয়া বলে—দেখো রণমলজি···হাতীকো বাচ্চাকে কেমন কোরে তার মা শুঁড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

রণমল বিরক্ত হয়ে বলে—থাম···বেল্লিক ! এখন কি করে প্রাণ বাঁচাবো তাই ভাবছি আর উনি হাতীর খেল দেখতে ব্যস্ত।

এমন সময় নীলাঞ্জীর তীক্ষ্ণ আওয়াজ কানে এলো—

হঠযাও···হঠ যাও—বানাকুবা মোট্টা বিবিয়াম্বা···ভাগো···

দেখতে দেখতে হাতীর দল শুঁড় তুলে বিকট বৃংহতীনিনাদে বন কাঁপিয়ে ছুটে এগিয়ে আসে বনের দিকে।

রণমলজীকে আর ভুলুয়াকে নিয়ে সর্দার মাখন সিং হাতী ঘাসের ঘন জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান।

তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে হাতীর যূথ। তাদের চিৎকারে গাছের মগডালে বসা বানরের দল কিচিমিচি করে উঠলো···বনের পাখীগুলো চ্যাঁচ্যা করে আকাশে উড়তে থাকে। ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে সর্দারজী বলেন—যাক আদমখোরের আশঙ্কাটা আজকের মত ইতি হোলো।

রণমলজি বলেন—কেন ?

সর্দারজী বলেন—কারণ এই জন্তুগুলোকে পিগমীরা সব চেয়ে ভয় করে। কারণ ওদের সামনে পড়লে ও ছোট্টা বেঁটেদের পায়ে পিষে দলে চলে যায়। ওদের ধরে ধরে শুঁড়ে উঠিয়ে আছাড় মারে। তাই ওদের উপস্থিতির আওয়াজ পেলে পিগমীরা ওদের ত্রিসীমা ছেড়ে পালায়।

রণমলজি জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে নিয়ে নীলাঞ্জী তখন কোথায় নিয়ে গেলো ?

—একটা মগর শিকার করাতে।

—মগর শিকার ?···কেন ?···

—বোধহয় নীলাঞ্জীর সংস্কার হচ্ছে যে এক আঘাতে একটা মগর শিকার করতে পারলে সুলক্ষণ, যাকে হিন্দীতে বলে সৌগন্।···তাছাড়া, ঐ উদ্দেশ্যে বন্দুক ছোঁড়াছুড়ি করলে বন্দুকের আওয়াজে শুধু আদমখোর কেন বনের অন্য জন্তু-জানোয়ারও দূরে সরে যাবে।

হাতীদের যূথ দূরান্তে চলে গেছে তা তাদের বৃংহতিতেই বোঝা যাচ্ছে। সর্দারজী এবার ঘাসের শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল···

রণমলজি বলেন—কুমীর শিকার শুভ না বদ সৌগন বোঝা যাচ্ছে না কারণ আমরা তো দেখছি, আমাদের চারদিক ঘিরে আসন্ন বিপদ ঘনিয়ে আসছে—

ভুলুয়া বলে ওঠে—শেঠজির ভয়, সারাদিনটাই তো এমনি ছুটোছুটি করে কেটে গেল। এখন রাত্রিবাস কোথায় করবেন···এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া তো সম্ভব নয় ?

রণমলজি বলেন—অথচ···

ভুলুয়া কথা কেটে বলে—বেলা পড়ে আসছে।

রণমলজি জিজ্ঞেস করেন—সর্দারজি, এখন কী করবেন ?

সর্দারজি বলেন—এখান থেকেই আমরা পায়ে হাঁটা শুরু করতে পারি।

রণমলজি ভীতস্বরে বলে ওঠেন—সে কি জঙ্গলের পথে হঠাৎ যদি আদমখোরদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়···তাহলে ?

সর্দারজী কথা কইতে কইতে ওদের নিয়ে দুর্ভেদ্য বনস্পতি আর গুল্মলতার ঝুরির আস্তরণের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন।

তীব্র বেগে লতাগুল্মের ঝুরি ধরে ঝুল খেয়ে নীলাঞ্জী এসে ওদের সামনে নেমে পড়লো।

রণমলজি বললে—একি নীলাঞ্জী! ওপার থেকে লতায় ঝুলে এখানে এসে পৌঁছে গেল ?

একটা অদৃশ্য তীর এসে সর্দারজীর সামনে ছিটকে পড়ল।

ভুলুয়া বললে—নীলাঞ্জী আমাদের টারজান হয়েছে শেঠজী···হা হা হা।

নীলাঞ্জী তার তর্জনী মুখের কাছে তুলে বলে—হিস···

তারপর আবার কি যেন শুঁকতে শুঁকতে বনের পথে পা রাখে।

সর্দারজী আস্তে আস্তে বলেন—বিপদ এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে।

হঠাৎ একটা অদৃশ্য তীর এসে সর্দারজির সামনে ছিটকে পড়লো।

'বাপ' বলে রণমলজি পাশ নিলেন—"খুব বেঁচে গেছি।"

সর্দারজি তীরটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন।

জঙ্গলাভ্যন্তরে হঠাৎ খসখস শব্দ শোনা যেতে থাকে।

নীলাঞ্জীর কণ্ঠ থেকে একটা একঘেয়ে সুরে গান শোনা যায়। সে গানের ভাষা—"বানাকুবা···ভাগো···আদমখোর···

সঙ্গে সঙ্গে বনান্তে বেজে ওঠে বিশখানা দামামার কঠিন বজ্রধ্বনি।

শোনা যাচ্ছে মরদ কণ্ঠস্বরে উল্লাস সংগীত···ভয়াবহ হুহুংকার···

রণমলজী নিম্নস্বরে বলে ওঠেন—মনে হচ্ছে…এরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

ভুলুয়া উত্তর দেয়—জি ;…আউর মালুম হচ্ছে—যে এরা আমাদের গন্ধ পেয়েছে… কথায় বলে হাউমাউ খাউ মানুষের গন্ধ পাঁউ !

সর্দারজি এক নিমেষে কি যেন ভেবে নিলেন, তারপর বলেন—Hurry up—জলদি—জলদি…আমার পেছু নিন।

রণমলজি বলেন—আর নীলাঞ্জী ?

—ওর পথ ও বেছে নেবে।

—সেটা কি ভালো হবে ? একটা মেয়েকে ফেলে রেখে…

—জঙ্গলের আইন তা নয় রণমলজি…পরস্পার পরস্পরের জন্যে চিন্তা করতে গেলে নিজেকেই বিপন্ন করতে হয়।

—তা হোক ··তবু ওকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

সর্দারজীর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। দৃঢ় স্বরে বলেন—বেশ তবে বন্দুক ঘুরিয়ে রেডি হোন…কারণ ওরা আসছে উন্মত্ত বুনোমহিষের মত।

ভুলুয়া বলে—শেঠজি ওসব গোলাগুলিতে ওদের শানাবে না…তার চেয়ে উঠে পড়ুন সব গাছের পিপেতে…।

রণমলজী বলেন—গাছের পিপে সে আবার কী ?

সর্দারজি উত্তর দেন—ভুলুয়া ইডিয়েট হলেও ঠিক suggest করেছে। চলুন আমাদের শেষ চেষ্টা করেই দেখা যাক…

রণমলজি বলেন—সেটা কী ?

—গাছের পিপে। ওই যে দূরের বাবলার সার। ওরই মাথায় মাথায় মগডালে বাঁধা আছে বিশ পঁচিশটা পিপে। ওরই মধ্যে বনের পথে পথ হারানো পথিক রাত্রির আশ্রয় নেয় নিজেদের জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পেতে। ওর মধ্যে আবার মধুর পিপেও রাখা আছে, যাতে মৌমাছিতে ছেয়ে আছে। যদি কেউ ওই পিপেতে লোক আছে সন্দেহ করে ওগুলিকে পাড়বার চেষ্টা করে…তখন পথিকরা নিজেদের পিপের ডালা বন্ধ করে মধুর পিপের চারপাশে তামাকুধোঁয়া ছাড়তে থাকে। মৌমাছিরা ধোঁয়ার শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে তখন নিকটস্থ আক্রমণকারীদের গায়ে হুল ফুটিয়ে তাদের লণ্ডভণ্ড বিপর্যস্ত করে দেয়…চলুন !

রণমলজি বাবলা গাছের দিকে প্রায় ছুটে চলেন। (ক্রমশঃ)

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওদিকে পিগমীদের দলের উল্লাস, গগনভেদী চিৎকার বনাঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছে। বড় বড় দামামার বিকট আওয়াজের প্রতিধ্বনি বনের পশুপক্ষীর বুকে সন্ত্রাস জাগিয়েছে। আর রক্ষা নেই! রণমলজি, ভুলুয়া আর সর্দারজী কোনরকমে গাছের মগডালে উঠে পিপের মধ্যে নিজেদের পুরে ফেলে মাথা উঁচু করে এই দুরূহ সংকটের গতি লক্ষ্য করতে থাকেন।

সর্দারজী হাফ ছেড়ে বলে ওঠেন—মনে হচ্ছে, পিগমীদের দলকে নীলাঞ্জী আটকে ফেলেছে।

রণমলজি বলেন—আটকে ফেলেছে নীলাঞ্জী···কেমন করে?

ভুলুয়া বলেন—কেন শেঠজী, নাচ দেখিয়ে।

রণমলজী বলেন—থাম বেল্লিক···রঙ্গ রাখ্।

সর্দারজী বলেন—না রণমলজি···ভুলুয়া ঠিকই বলেছে। পিগমীদের বুশমেন গালদের ওপর ভীষণ লোভ। নীলাঞ্জী তার নাচ দিয়েই তাদের ঠেকিয়ে রেখে আমাদের পালাবার অবসর দিয়েছে।

রণমলজী বলেন—যদি ওরা নীলাঞ্জীকে ধরে নিয়ে যায়···মেরে ফেলে?

সর্দারজী বলেন—মেরে ওরা ফেলবে না ওকে, কারণ বুশমেন গার্লদের পেলে ওরা বিয়ে করে ঘরসংসার করে এই ওদের রীতি। তাছাড়া এক্ষেত্রে নীলাঞ্জীকে ওরা ধরেও রাখতে পারবে না। কারণ নীলাঞ্জী আগে থাকতেই তার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

—কি রকম?

—যে মগরটাকে শিকার করা হয়েছে, সেটাকে মেরে ফেলা হয়নি। সেটাকে

অর্ধমৃত অবস্থায় বর্শার বড়শিতে গেঁথে জলে জীইয়ে রাখা হয়েছে রেশমী রশিতে বেঁধে। তাই সে কুমীর এখন টারবুলেণ্ট হয়ে নদীবক্ষে অপেক্ষা করছে। নীলাঞ্জীর যদি কোন বিপদ ঘটে ওই পিগমীদের নিয়ে ও অনায়াসে মগরটার দড়ি কেটে দিয়ে একখানা বড় পাথর জলের বুকে ছুড়ে দেবে। যাতে মনে হয় ও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পিগমীরা তখন ওকে ধরতে সঙ্গে সঙ্গে জলে ওর পিছুতে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর ঐ মগরপুঙ্গবটি তখন এতোই ক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে যে, যে মুহূর্তে তারা জলে পড়ে সাঁতরাতে যাবে, সেই মুহূর্তে তারা ওই মগর দ্বারা আক্রান্ত হবে। শুধু তাই নয় মগরের গোষ্ঠীবর্গ সবাই একসঙ্গে ওদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে।

রণমলজী বলেন—ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া!

সর্দারজী বলেন—বনে জঙ্গলের আইন কানুন, বুদ্ধি চালনা শুধু জন্তু-জানোয়ার জংলীদের instinct-এর Advantage নিয়ে। তাই এগুলো শুনলে রূপকথার গল্প বলে মনে হয়···মনে হয় এসব আজগুবী!

নীলাঞ্জী একরাশ 'গেঁজেভরা সামগ্রী' সর্দারজীর হাতে তুলে দেয়।

* * *

সন্ধ্যার ছায়ায় আকাশের রং গাঢ় করে তুলেছে। এখনই সূর্য অস্তাচলে চলে যাবে। ইতিমধ্যে বনের অন্তরালে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে।

অদূরের দামামা ধ্বনির উল্লাস যেন আরও বেড়ে উঠেছে। এমন সময় বাবলা গাছের নীচে থেকে অস্ফুট ক্ষীণ স্বরে নীলাঞ্জীর আওয়াজ ভেসে আসে।

—বানাকুবা নীচে সিম্মি···উবাড়ো···লেটে···জহরত্···

মাখন সিং সে আওয়াজ কান পেতে শোনেন। বার বার ঐ একই উক্তি। গাছ বেয়ে নেমে এসে দাঁড়ান সর্দারজি।

নীলাঞ্জী একরাশ 'গেঁজেভরা সামগ্রী' সর্দারজীর হাতে তুলে দিয়ে সর্দারজীকে

কানে কানে অনেকক্ষণ কি সব বলল। তারপর নিমেষের মধ্যে জঙ্গলের বিকট অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

সর্দারজী ইশারা করেন রণমলজি আর ভুলুয়াকে নেমে আসতে। তারপর তিন জন ক্ষীণ নদীর ধারে ধারে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেন।

* * *

পিগমীদের দলে প্রায় দেখা যায় পঞ্চাশোর্ধ্ব জনবল। সবাই গোল হয়ে উন্মত্তনৃত্য নাচছে। মাঝে বিশজন তীর ধনুক হাতে লক্ষ্য উঁচিয়ে এগিয়ে চলে।

নীলাঞ্জী এসে ঢুকে পড়ে তাদের জলসায়।

নাচতে শুরু করে দেয় সে।

তারপর সারা দলটাকে নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়ে চলে নদীর ধারে, যেখানে রাখা আছে সেই বর্শাবিদ্ধ মগরটা।

* * *

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কুমীরপূর্ণ নদীর স্রোতের ওপর তিনখানি নৌকাকে দেখা যাচ্ছে। সকল আরোহীরাই বর্শা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে ছিটকে পড়লো নদীর বুকে···তারপর অশ্রান্ত বিকট গগনভেদী চিৎকারে নদীর পারে দেখা দিল পিগমীর দল। দূর থেকে দুম্···দুম্···দুম্··· বন্দুকের আওয়াজ!

পিগমীর দল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিতে শুরু করে দিল—উঃ কি অদ্ভুত সাঁতারু ওরা!

কিন্তু কি অসম্ভব কাণ্ড! দূরের অবিরত গুলি বর্ষণ, বর্শা নিক্ষেপ আর জলে শতশত কুমীরের সঙ্গে ঝটাপটিতে নদীর স্রোত উত্তাল হয়ে উঠলো।

ভোরের সূর্যরশ্মিতে জলে রক্তিম আলো ছিটিয়ে দিয়েছে। না—না ও যে রক্ত-স্রোত। ওই কুমীরগুলো প্রায় সবার মুখেই একটা করে মাংসপিণ্ড নিয়ে জলের মধ্যে ঝটকা মারছে।

(১৯)

আমাদের পুরানো ক্যাম্পে ফিরে এসেছি।

রণমলভাই-এর রৈঞ্জুরু ক্যাম্পে।

রণমলভাই বললেন—আপনাদের সুটিং দেখে বড় ভালো লাগলো। হয়ত আপনাদের ছবিতে একচুয়াল ঘটনার ওপরও একটু রং চড়ানো হোলো, কিন্তু জঙ্গলে এই রকমই ঘটে থাকে। এতে অবান্তরের কথা আসে না। কত রকমে কত ছলকলায় আততায়ীকে প্রাণ-রক্ষায় উপায় বার করতে হয়, তা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে না পড়লে বোঝা যায় না।

আমি বলি—নীলাঞ্জীর প্রেরিত গেঁজেগুলোতে কি কি পেলেন?

উনি বলেন—আসুন না আমার ক্যাম্পে, ওগুলো ঢেলে রেখেছি। নিজে চোখেই দেখবেন।

আমরা রণমলভাই-এর ক্যাম্পে গিয়ে দাঁড়াই। মেঝের ওপর ঢালা রয়েছে বিভিন্ন রকমের জিনিসের স্তূপাকার।

উনি বলেন—ওর মধ্যে ছখানা ডায়মণ্ড পাওয়া গেছে, যার দাম অন্তত-পক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার। তাছাড়া ধরুন হাতীর দাঁতের বড় বড় মালা··· সিংহের নোখ···২৪ খানা পদ্মরাগ পাথর ···এই রকম কত যে মূল্যবান সংগ্রহ। এগুলো পিগমীরা সংকলন করে ওদের গেঁজের মধ্যেই রেখে দেয়। আমরা বুশগার্লদের শিক্ষা দিয়ে এমনি করেই ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নি···

—আসুন না আমার ক্যাম্পে···

—ছিনিয়ে নিলে ওরা দেয় কেন?

কারণ ওরা জলে নামতে চায় না এগুলোর জন্যে। পাছে জল লেগে এগুলো নষ্ট হয়ে যায় তাই ওরা এগুলো গচ্ছিত রাখে মেয়েদের কাছে জলে ঝাঁপ দেবার আগে। বুশমেনগার্লদের উপর যুগযুগ ধরে লোভ। নীলাঞ্জীকে তাই বিশ্বাস করে ওগুলো গচ্ছিত রেখেছিল আপনাদের পেছনে ধাওয়া করবে বলে।

আমি বলি—তাহলে নীলাঞ্জীর মত প্রতিবারই আপনাদের একটি করে বুশম্যান-গার্ল খোয়াতে হয়। কিন্তু নীলাঞ্জীকে হারিয়ে পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

রণমলভাই বলেন—বনের সম্পদ বনেই আছে। তাতে আমাদের মত সভ্য জগতে দুশ্চিন্তাই বা কি আর মনখারাপই বা কেন?

আমি চুপ করে থাকি।

উনি বললেন—আচ্ছা, আপনাদের কালকের আর পরশুর শট্ তুলতে কত ফিল্ম খরচ হলো?

আমি বলি—বোধ হয় তিরিশটা রোল…অর্থাৎ তিরিশ হাজার ফুট। কাল তো ৪টা ক্যামেরার কাজ চলছিল। আমি, জগতাপ, মিঃ ব্যানার্জি আর সুধীর চারজনে ক্যামেরা চালিয়েছি।

উনি বলেন—যা যা নেবার সব তুলে নিয়েছেন তো ?

আমি বলি—আমার ইনসট্রাকশন ছিল সবটাই উঠিয়ে নেওয়া হবে, তার মধ্যে যা যা দরকার এডিটিং-এ রেখে দেবো।

রণমলভাই বলল—আমাদের না পেটের দায়ে এই ভয়াবহ জঙ্গলের মাঝে পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু ভাবছিলাম আপনারা কিসের জন্য লাইফে এত রিসক নেন ?

আমি বলি—নেশায়। যেমন আপনার নীলাঞ্জী আপনাদের জন্য বা আমাদের জন্য এত বড় রিসক নিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাজ করে গেল।

রণমলভাই বলেন—তা বটে। তা না হলে ওরা পেট পুরে খাওয়া আর ভাল ব্যবহার ছাড়া কি বা পায় বলুন ?

সর্দারজি বলেন—ওদের প্রয়োজনবোধও তো ওইটুকুই।

আমি বলি—তা বটে !…কিন্তু ও বিশ্বস্ত কুকুরদের মত আপনার আমার উপকারে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিল। তার দাম দেবো বললেই তো দেওয়া যায় না তা প্রয়োজনেই হোক আর অপ্রয়োজনেই হোক…

রণমলভাই বলেন—ও যদি ফিরেই আসে তাহলে বুঝবো ওর প্রয়োজন ছিল।

আমি বলি—কি প্রয়োজন ছিল ?

রণমলভাই বলেন—ওর জীবনে প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়েছিল, স্বামী-ঘর-কন্যা…

আমি বলি—সে তো ও নিজের গোষ্ঠীতেও করতে পারত ?

রণমলভাই বলেন—সেখানে সে ওদের গোষ্ঠীর কাছে প্রতারিত হয়েছে…কারণ ওর স্বামীর ও সপ্তম বধূ।

—তাই নাকি ! ওদের মধ্যে কি এমনিতর একজন পুরুষ বহু বিবাহ করে ?

—হ্যাঁ মিঃ বোস !

আমি বলি—তবু আমার কি মনে হয় জানেন…নীলাঞ্জী আপনাদের কাছে ফিরে আসবেই…যদি অবশ্য ওদের হাত থেকে রক্ষা পায় অর্থাৎ ওরা ওকে মেরে খেয়ে না ফ্যালে।

রণমলভাই মৃদু হেসে বলেন—নীলাঞ্জী দেখছি আপনার মনে বেশ দাগ কেটেছে।

আমি বলি—তা সত্যি, যদি বলেন যতদিন বেঁচে থাকবো, ওকে আর ওর অকাতরে জীবন বলির কথা ভুলতে পারবো না। (ক্রমশঃ)

বিষুব রেখার অন্তরালে

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]

আজকেই বেলা দশটার মধ্যেই আমাদের যাত্রা করতে হবে, তাই আমাদের সঙ্গীদের মধ্যেও যত তাড়া, রণমলভাই-এর পক্ষেও তেমনি তাড়া। রণমলভাই আমাদের যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। আমরা এখান থেকে নৌকাযোগেই যাচ্ছি ফোর্ট পোরট্যালে…ওখান থেকে ইউগাণ্ডার দিকে রওনা দেবো…আমাদের সাফারির লরী আর পিক্‌আপ্ অপেক্ষায় আছে।

সেমলিকি নদীর ওপর পরপর চারখানা বোট সাজানো, Ready…তিনখানি নৌকা আমাদের জন্যে, আর একখানি রণমলভাইয়ের নিজের জন্যে। এ যেন এক নৌকার কনভয়।

যাত্রার অনতিপূর্বে রণমলভাই আমায় তাঁর ক্যাম্পে নিরালায় ডেকে নিয়ে আমার হাতে কয়েকখণ্ড পাথর ধরিয়ে দিলেন।

আমি বলি—এগুলো কি…এ যে পাথর!

উনি বলেন—এটা তো চিনতে পেরেছেন?

আমি দেখি লালমত একটা পাথর…তার ভেতর রয়েছে এক ঔজ্জ্বল্য চাপা…

আমি বললাম—এটা লাল কোয়াড্‌জ পাথর?

উনি বলেন—কোয়াডজের মতই কাঁচা পাথর মাত্রেই দেখায়। এটা পদ্মরাগমণির পাথর। পাথর-কাটিয়েদের কাছ থেকে কাটিয়ে নেবেন তারপর বুঝবেন এর কদর।

আমি বলি—পদ্মরাগ পাথর মানে চুনি তো?

উনি বলেন—না…চুনীর ঔজ্জ্বল্য বেদানার দানার মত, কিন্তু পদ্মরাগ পাথর কাটাবার পর দেখবেন ওপর থেকে এর ঔজ্জ্বল্য বাদামী হলদে বলে মনে হবে। কিন্তু এর মধ্যে একটি লাল স্পট্ পাবেন, যা এর বাদামী হলদে চেহারা বদলে লালাভ করে তালে।

রাত্রে এ পাথর দেখাবে লাল আর দিনের বেলায় বাদামী লালের অংশের মাঝে রক্তাভ আভা!

আমি বলি—এ পাথরগুলোও কি তবে সব দামী দামী পাথর?

উনি বলেন—এখানা স্বর্ণ-পাথর (Gold ore)…বাইরে থেকে একে দেখলে মনে হয় একখানা সামান্য পাহাড়ে পাথর, কিন্তু যদি পরিষ্কার জলের মধ্যে একে ছেড়ে দেওয়া যায়, দেখবেন এর গাভর্তি সোনার কুচি চিকচিক করছে…এই সব পাথর crust করে …process করে সোনা বার করা হয়।

এটা পদ্মরাগমণির পাথর। [পৃষ্ঠা ১০৬

এবার এ পাথরটা দেখুন কত ছোট্ট, কিন্তু ওজনে কত ভারী বলে মনে হবে। এ পাথরখানা কিসের জানেন, ‘প্ল্যাটিনাম ওর’। এ থেকেই প্ল্যাটিনাম বার করা হয়। জগতে এ ধাতুর চেয়ে দামী ধাতু আর নেই।

আর একখানা মাঝারি পলতোলা পাথর আমার হাতে দিয়ে বলেন—এটা কিন্তু দামী নয়, তবে খুব ভারী পাথর। এটা হচ্ছে “টিন-ওর”। শুধু specimen হিসাবে দিলাম।

আমি ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিই।

উনি আমার হাতে আরও দুটো জিনিস বার করে দিলেন—একটি হচ্ছে হাতীর দাঁতের একছড়া মালা…আর দুটো সিংহের নখ। আমায় বললেন—সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিলে সুন্দর দেখাবে…আর নখ দুটোতে দুটো লকেট হবে। আপনার স্ত্রীকে আমার নাম করে দেবেন।

আমি হাসি…বলি—স্ত্রীই নেই তো…

উনি কথা কেটে হেসে বলেন—বেশ তো এখন নেই—যখন হবে তখন দেবেন…আর বলবেন এগুলো কঙ্গো বনের এক জংলী মেয়ে নীলাঞ্জী সংগ্রহ করেছিল পিগ্‌মীদের গেঁজে থেকে…যে মেয়ে আমার মনে দাগ কেটেছে।
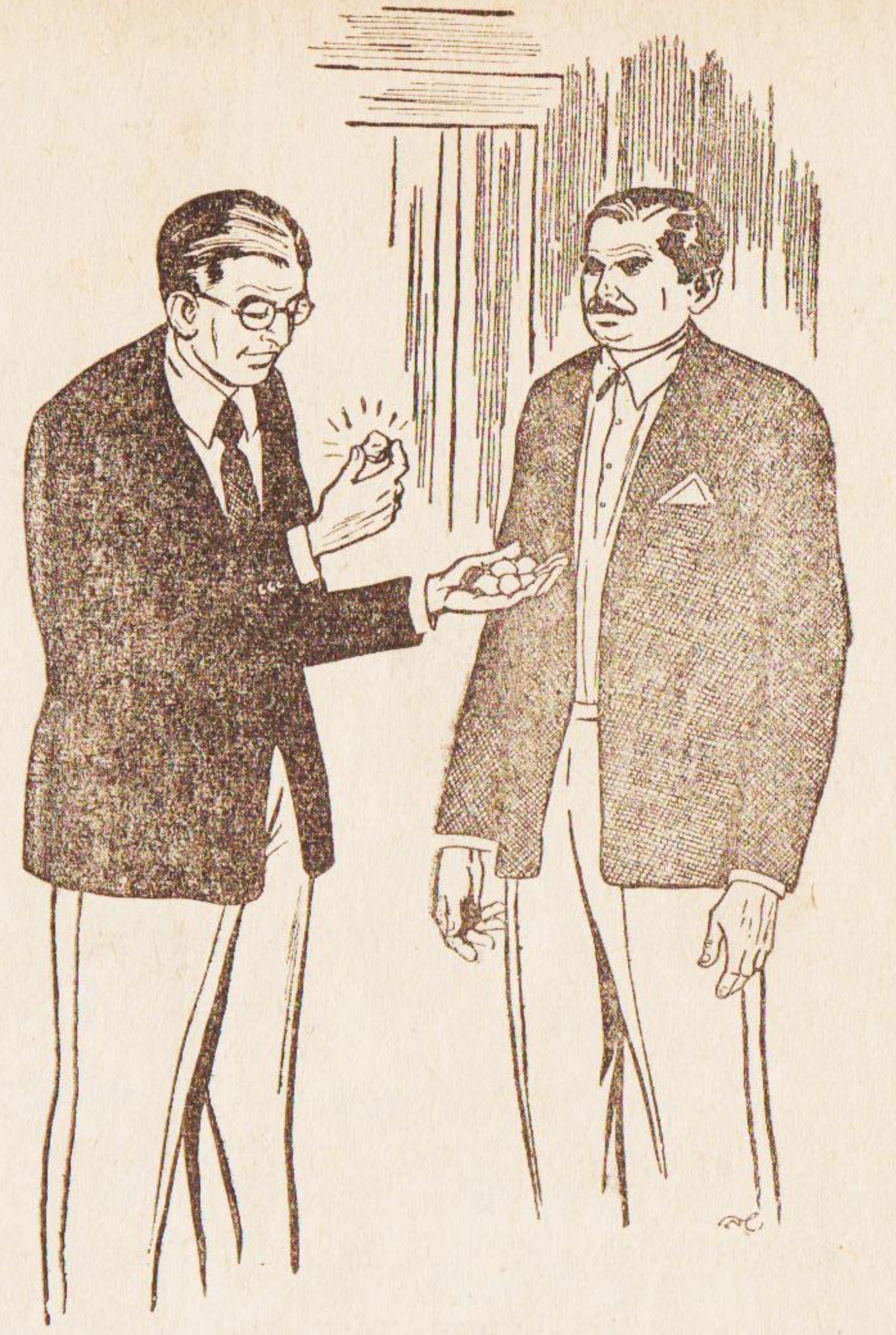
হো হো করে রণমলভাই হাসতে থাকেন।

আমি বলি—যাঃ বেশ বলেছেন। তবে যত ঠাট্টাই করুন নীলাঞ্জীর তৎপরতা কর্মকুশলতা আর বুদ্ধিচালনা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তার নাচও আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উনি বলেন—নীলাঞ্জীকে আমি আশ্রয় দিয়ে তৈরি করেছিলাম আমার নিজেরই স্বার্থে সে কথাটা ঠিক। কিন্তু আজ আমার অবস্থাও অনেকটা আপনারই মত মিঃ বোস। বোধ হয় ওকে আর কাউকে দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো না।

বুশমেন সর্দার ঘরে এসে ঢুকে রণমলভাইয়ের জিনিসগুলি নৌকায় তুলে দেবার জন্যে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রণমলজী বলেন—এই বুশমেন সর্দারও হচ্ছে আমার আরও একটি সংকলন। আমৃত্যু হয়ত আমায় সেবা করে চলবে···কিন্তু কি বা মূল্য আমি ওর দিই।···ভেবেছিলাম নীলাঞ্জীর সঙ্গে ওর সাদী করিয়ে দিয়ে এইখানেই ওদের বসতি তৈরি করে দেবো···

অজান্তে আমার বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রণমলভাইও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

রণমলভাই বললেন—জংলী জীবনে দয়ামায়া মমতাগুলো অবান্তর পর্যায়েই পড়ে থাকে মিঃ বোস···তবু আমাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন পরিবারবর্গের কথা মনে করলে এদের দেখেও মাঝে মাঝে মায়া আসে।

*　　　*　　　*

সবাই Ready···

সবাই এসে একে একে নৌকায় পদার্পণ করি।

রণমলভাই বলেন—অল্ ও-কে···স্টার্ট···তারপর আমার দিকে চেয়ে হো—হো করে হেসে ওঠেন।

—আজ আমি ডাইরেকশান দিয়ে নিয়ে চলবো। এ আর আপনার ছবির স্যুটিং নয় মিঃ বোস। এ হচ্ছে আমার একচুয়াল এড্‌ভেনচারাস্ জারনী!

নৌকা একসঙ্গে ছেড়ে দিল।

আবার সেই বন্য মাঝিদের হুইল্লালা আওয়াজ সুরে সুরে সেমলিকির দুই তীর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দূরে সরে যাচ্ছে রৈঞ্জরু ক্যাম্প।

মনে হচ্ছে···এখনি রৈঞ্জরুর কথা আমার অতীত অধ্যায়ের এক চমকপ্রদ কাহিনীতে রূপান্তরিত হবে। ঐ দূরের মোহনা···লক্ষ কুমীরের জলক্রীড়াভূমি ডান পাশে পড়ে রইলো। সেও এক আরব্য উপন্যাসের গল্প পর্যায়ে পর্যবসিত হোলো।

তবু চলেছি বাস্তব প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। সেমলিকি নদীর অপর পারে পাহাড়ের পর পাহাড় ছুটে চলেছে···এ পারে রিয়াঞ্জারো রেঞ্জের দৌড়।

ওপারের পাহাড়গুলোর পাথরে সূর্যকিরণ পড়ে যেন হীরের মত জ্বলজ্বল করে উঠছে।

রণমলভাই আঙুল দেখিয়ে বলেন—ঐসব পাহাড় এখান থেকে বহুদূর নয়। ওগুলো লেক এলবার্টের পশ্চিম উপকূলে। ওইগুলিই হচ্ছে আসল সোনার পাহাড়··Mount of the Gold। এর খাদে খাদে অফুরন্ত সোনা···যা সারা পৃথিবীর লোক তুলে শেষ করতে পারবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করি—এসব কার সম্পত্তি?

রণমলভাই হেসে বলেন—"খুঁজি খুঁজি নারী—যে পায় তারই।"

বেলজিয়ান কঙ্গোর সম্পত্তি আপাততঃ বেলজিয়ামের। তবে পূর্বের নিউগিনির গোল্ডকোস্ট লাইন পর্তুগীজদের প্রথম সভ্যজগতে আবিষ্কারক তাই আজও তারা তার মালিক।

আমি এখন সামান্য হলেও রৈঞ্জরুর মালিক হয়ে বসে আছি···আসলে আমরা সবাই লুটেরা···সবাই ডাকাত। সম্পত্তি হচ্ছে বুনোদের···জংলীদের···ঐ আদমখোরদের। তারা তাদের দেশকে চেনে না··জানে না। তাই বিদেশীর দস্যুর দল তাদের হাতে কাঁচ তুলে দিয়ে হীরে কেড়ে নিচ্ছে।

প্রকৃতির সন্তানদের প্রকৃতিস্বভাবকে ভেঙেচুরে সভ্য বানাবার চেষ্টা করছে নিজেদের প্রয়োজনে। কিন্তু আমি জানি মিঃ বোস, যেদিন ওরা আমাদের মত চক্ষুষ্মান হয়ে উঠবে, বেধে যাবে রাম রাবণে লড়াই···

সোনার লঙ্কার অধিকারী রাক্ষসরাই থাকবে।

তবে অসভ্য রাক্ষসদের নয়···আমাদের শেখানো শিক্ষাদীক্ষায় এক সভ্য রাক্ষসদের হাতে।

আজ আমরা যেমন ওদের রাক্ষস নরখাদক আদমখোর আখ্যা দিয়ে ওদের সম্পত্তি নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি, ওরাও সেদিন আমাদের রাক্ষস দস্যু তস্কর বলে তাড়া করে আমাদের এদেশ থেকে দূর করে দেবে।

রণমলভাইয়ের কথাগুলোর সত্যতা হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে চুপ করে থাকি।

নৌকার মাঝিদের একঘেয়ে গানে যেন মায়া আছে··কঙ্গোর ভীষণ জঙ্গল পরিবেশেও তা যেন মনে ছন্দ কাটতে থাকে।

মিঃ ব্যানার্জী বলেন—কি মিঃ বোস আজ এমন চুপচাপ কেন, অ্যাডভেঞ্চার এখনও শেষ হয়নি···পুবের আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন !

পুব আকাশের কোলে কালো মেঘ জমে উঠেছে···ক্ষণে ক্ষণে তাতে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে···

আমি বলি—এ কি ? বৃষ্টি হবে নাকি ?

রণমলভাই বলেন—ভয় নেই···বৃষ্টির এখনও এক সপ্তাহ দেরি আছে। এ অঞ্চলে··· বিশেষ করে বিষুবরেখার ওপর বৃষ্টি হবার সাত আটদিন আগে থেকেই এই বিজলীর খেলা আকাশের গায়ে গায়ে দেখা যায়···এই নিশানায় বুঝি যে বর্ষার সময় কাছে এসে পড়েছে।

আমি বলি—শুনেছি যে এখানে একবার বর্ষা নামলে আর থামতে চায় না। সারা বনস্থলীর রূপ এমন ভয়ংকর হয়, যে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায় ! তাই তো আমরা এত তাড়াতাড়ি করে সব জায়গাই সুটিং সেরে নিতে ছুটোছুটি করে মরছি !

রণমলভাই বলেন—হ্যাঁ এখানে বছরে তুবার করে বর্ষা আর তুবার করে শীত পড়ে। অন্য ঋতু এ দেশে নেই। এবারের বর্ষা বড় বর্ষা। বর্ষার সময় এ সব নদী ধরে ভীষণাকার। তুপাশের পাহাড় থেকে অবিরল ধারায় তুরন্ত স্রোত নেমে আসে। জঙ্গলের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত জল জমে। এখানকার ব্ল্যাকবটন সয়েলে জল পড়ে তা হয়ে ওঠে এক চটচটে আঠা···কার সাধ্য পা ফেলে পা তুলতে পারে। গাড়ির চাকাগুলোকে যেন আঠার মত আটকে ধরে। এই সব বিপদ। তাই ও সময়টা কাজ করা যায় না, তাইতো আমরা পিঁপড়েদের মত রোদেই খাবার সংগ্রহ করে রাখি !

আমি বলি—আমাদের ফোর্ট পোরট্যাল পৌছাবার মধ্যে বৃষ্টি নামবে না তো ?

মাখন সিং এবার কথা বলেন—কঙ্গোতে বৃষ্টি নামবার প্রায় চার পাঁচদিন পরে বৃষ্টি নামে ইউগাণ্ডায়। কেনিয়াতে তারও চার পাঁচদিন পরে বৃষ্টি পাওয়া যায়। কাজেই আপনারা স্টীমারে ওঠার পরই ধরুন বৃষ্টি নামবে।

* * *

ফোর্ট পোরট্যালে এসে যথাসময়েই পৌঁছে গেলাম। পথের তুর্যোগ পথের ধারেই ছেড়ে এসেছি। পৌঁছে গেছি সর্দারজীর বারান্নার কুঠিতে।

সর্দারজীর বিদায় সম্ভাষণ শেষ করে যেদিন মোটরে উঠে বসলাম সেদিনই প্রথম দেখলাম···সর্দারজীর তুচোখ ভরা জল।

হাঁ করে চেয়ে থাক···ভাবি দস্যু রত্নাকরের চোখেও জল···যে নিষাদ পশুপক্ষী মেরে জীবনের পরমানন্দের সন্ধান পেয়েছে·· সে কি করে এই সামান্য সৌহার্দ্য বেদনায়

আকুল হয়ে ওঠেন। ভারী অদ্ভুত ভগবানের সৃষ্টি···একই মনের মধ্যে এই কোমল-কঠিনের সমন্বয়···এ কি করে সম্ভব হয় ?

আমার চোখের পাতাও ভিজে উঠেছে। বললুম—আজ থেকে আমাদের এই এক্সপিডিশন হয়ে থাক আমাদের তুটো জীবনের এক স্মৃতির ভাণ্ডার। যদিও জানি আপনার স্মৃতি বিরাট ভাণ্ডারের এক কোণেই স্থান হবে। তবে হয়ত কোনো এক অবসরক্ষণে আপনার মনে জাগবে আমাদের সেই ভয়কাতর মুখগুলি আর তাদের ভয়ার্ত আর্তস্বর।

* * *

ফিরে এসেছি ভারতবর্ষে—।

ফিরে এসেছি কলকাতায় নিজের আবাসে।
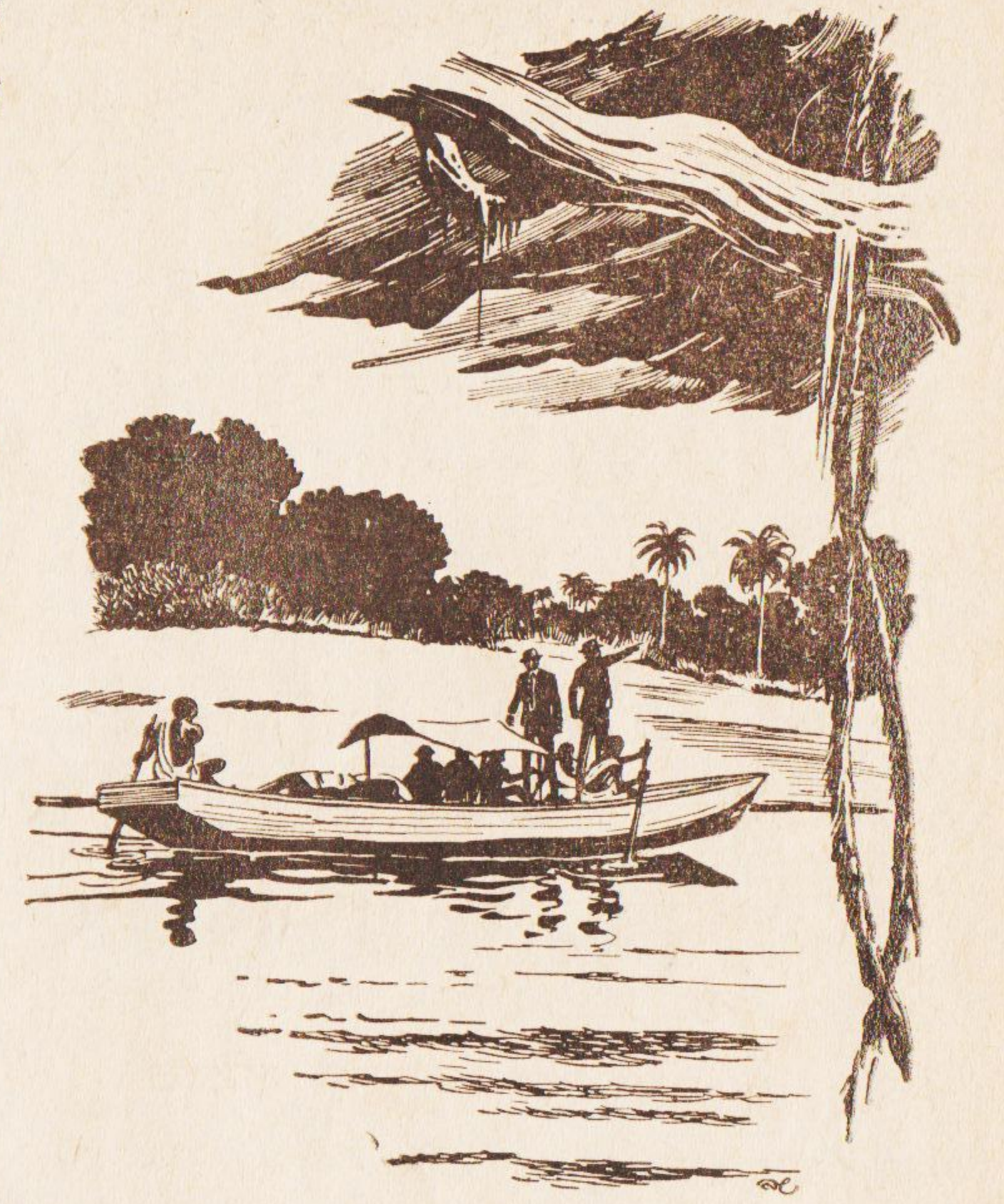
পুর্বের আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন।

[পৃষ্ঠা ১৩০

সেইখান থেকে আফ্রিকার সব জায়গাতেই একখানা করে চিঠি দিলাম।

তিনখানি চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। তার মধ্যে রণমলজী ভাইকে লিখেছিলাম নীলাঞ্জীর কথা।

উত্তরে রণমলভাই লিখেছিলেন যে চিঠিটা সেটা তুলে দিচ্ছি।

"রেঞ্জরু"···কঙ্গো।

শ্রদ্ধাপদেষু বোস সাহেব,

আপনার প্রাণের আবেগপূর্ণ ধন্যবাদ চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি। আফ্রিকার জঙ্গলে যাঁরা আসেন···তাঁরা ফিরে গিয়ে কখনই আমাদের মনে রাখেন না···তা কি ইংরেজ··· ভারতীয়···আরবী বা আমেরিকান।

বহু হাণ্টার আমার ক্যাম্পে থেকে গিয়েছেন কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আপনার চিঠির আশাও আমি করিনি। কাজেই আপনার চিঠি পেয়ে এতই আনন্দ পেয়েছি তা চিঠিতে লিখে জানানো যায় না। তার উপর আপনার আন্তরিক মনের অভিব্যক্তি আমায় সত্যিই অভিভূত করেছে।

এ ছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি···যে আপনি এখানকার ছোট ছোট ঘটনারও উল্লেখ

করতে ভোলেন নি···অর্থাৎ আমার দেওয়া ওই সামান্য উপহারের কথাই বলতে চেয়েছি··· কিবা দিয়েছি···আর তা আপনার কতটুকুই উপকারে লেগেছে।

আমার পদ্মরাগ পাথর কাটিয়ে নিজের হাতের আঙটিতে বসিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখবার চেষ্টা করছেন জেনে অভিভূত হয়ে পড়েছি।

আপনি দেখছি এখানকার লোকজনদের কথা পর্যন্ত ভুলে যাননি···বুশমেন সর্দারকে আপনার চিঠি পড়িয়ে শুনিয়েছি। সে তো মহা খুশী।

এমন ব্যাপার যে এ জগতে ঘটে···কেউ কারও জন্য এতদূর থেকে চিঠি লেখে···এটাই তার কাছে পরম আশ্চর্য।

এখানকার সব ভালভাবেই চলেছে···তবে আপনাদের যাবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা নেমেছে। আপনারা লাকি···নইলে এবার বর্ষা দুদিন আগেই নেমেছে।

সর্ব পরিশেষে জানাই যে···

আপনার নীলাঞ্জী আবার ক্যাম্পে ফিরে এসেছে।

—সমাপ্ত—

কলিকাতার বাগবাজার হইতে শ্রীচণ্ডীদাস পাল তাঁর স্বর্গগত পুত্র শান্তনুকুমার পালের পুণ্য-স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

হিংসার ফল

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩১শে বৈশাখ ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী শ্রাবণ ১৩৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

জন্ম : ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
মৃত্যু : ৬ই ভাদ্র ১৩৭৯

প্রথম পুরস্কার ১০·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ৫·০০ টাকা**